NIKATKATHA
by Samaresh Majumder
Published by
UJJAL SAHITYA MANDIR.
C-3, College Street Market.
Calcutta- 700 007, India

প্রাপ্তিস্থানঃ
উজ্জ্বল বুক স্টোর্স
৬এ, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলিকাতা— ৭০০ ০৭৩

প্রতিষ্ঠাতা ঃ
শরৎচন্দ্র পাল
কিরীটিকুমার পাল

প্রকাশিকা ঃ
সুপ্রিয়া পাল
উজ্জ্বল সাহিত্য মন্দির
সি-৩, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট
কলিকাতা- ৭ (দ্বিতলে)

বর্ণ সংস্থাপনে ঃ
প্রদ্যোৎ সাহা
৭, কামারডাঙ্গা রোড
কলিকাতা-৪৬

মুদ্রণে ঃ
জি. পি. ডি. বক্স
৩বি, ছাতুবাবু লেন,
কলিকাতা-১৪

প্রচ্ছদ ঃ
রঞ্জন দত্ত

ISBN 81 7334 086–2

উৎসর্গীকৃত

এই লেখকের
আমাদের প্রকাশিত বই

আকাশ না পাতাল
তেরো পার্বন
হারামির হাতবাক্স
কালোচিতার ফটোগ্রাফ
ভালোবাসা থেকে যায়
জননী দেবী
হাওয়া বদল
আলটপকা
সন্ধেবেলার মানুষ
সুনির্বাচিত

আজকাল এটা খুব হচ্ছে। আর কারও হচ্ছে কিনা জানি না, আমার হচ্ছে। কারও সঙ্গে কথা বলতে গেলেই গা গুলিয়ে ওঠে, বমি পায়। নিজের পাছায় লাথি মারা যায় না বলে সেই বমিটা গিলে ফেলি। আমি তাই চেষ্টা করি কম কথা বলতে, একদম যদি না বলতে পারতাম তাহলে মন্দ হত না।

আমি যে বাড়িটায় থাকি সেটা তৈরি হয়েছিল আমার জন্মানোর বহুবছর আগে। একতলার কোণের ঘরটা আমার জন্যে বরাদ্দ। ঘরটায় সুবিধে হল রাস্তা দিয়ে ঢোকা যায় আবার ভেতরে যাওয়ার দরজাও আছে। ওই ঘরেই আমি থাকি আর আমি কথা বলতে ভালবাসি না সেটা বাড়ির সবাই জেনে গেছে বলে আমায় কেউ বিরক্ত করে না। আমার বয়স এখন আঠাশ।

আমার বার্থ সার্টিফিকেটে যে জন্ম-তারিখ লেখা রয়েছে সেটা ধরলে আমার বয়স এখন সাতাশও হয়নি। স্কুলে ভর্তি করার সময় কর্পোরেশনকে ম্যানেজ করে বাবা একটা বার্থ সার্টিফিকেট জোগাড় করে ভেবেছিল, ছেলের আয়ু এক-দেড় বছর বাড়িয়ে দিলাম। এটা শুধু আমার ক্ষেত্রেই নয়, আমার সঙ্গে পড়ত এমন অনেক ছেলের দেখেছি দু'নম্বরী বয়স করে দিয়েছে বাপ মা। জিজ্ঞাসা করলে ওনারা বলবেন, যা চাকরির বাজার, হাতে দেড়-একবছর থাকলে খোঁজাখুঁজির সুবিধে হবে। অর্থাৎ ধরেই নেওয়া হয়েছিল আমরা চাকরি পাব না ঠিক সময়ে, দরজায় দরজায় খুব ঘুরতে হবে এবং সেই ফাঁকে সময়সীমা ফুরিয়ে যেতে পারে, তাই ওই বাড়তি সময়টুকু দিলে আমাদেরই উপকার হবে। বার্থ সার্টিফিকেটের কথা কিন্তু মা-বাবার মনে নেই। আমার পনের বছর বয়স পর্যন্ত এ বাড়িতে পায়েস হত ঠিকঠাক জন্মদিনে। পনের বছর বয়সে মা মারা যান।

আমার একটা এম. এ. ডিগ্রি আছে। বঙ্গ সন্তান স্কুল থেকে বেরিয়ে কলেজে ভর্তি হয়। কলেজ থেকে ইউনিভার্সিটিতে। কেন ভর্তি হচ্ছে, যেটা পড়ছে সেটা পড়ে পরে কি উপকারে লাগবে এ নিয়ে কেউ ভাবে না। তুমি এম. এ. পাশ করেছ, টাকাপয়সা খরচ করে পড়িয়েছি এতদিন, এবার চাকরি করে সংসারের উপকারে এসো। কিন্তু ইতিহাস, বাংলা অথবা ফিলজফি নিয়ে পঞ্চাশ বাহান্ন পেয়ে পাশ করে হাত পাতলে যে চাকরি পাওয়া যায় না এ কথাটা ওরা যখন

বিশ্বাস করবেন তখন ওঁদের কাছে আমরা ঘি শুকিয়ে যাওয়া ছাই এর গাদা ছাড়া আর কিছু নই।

এই এক গ্যাঁড়াকল। পশ্চিমবাংলার প্রতিটি কলেজে প্রতিবছর হাজার হাজার ছেলেমেয়ে ভর্তি হচ্ছে। তাদের কাছ থেকে টাকা নিয়ে তিনবছর ধরে হিউমানিটিজ গ্রুপের বিষয়গুলো পড়ানোর অভিনয় করা হয়। ছেলেমেয়েগুলো সেই বৈতরণী পার হবার পর দ্যাখে অর্জিত বিদ্যা কোন কাজে লাগছে না। স্কুলে মাস্টারি করতে গেলেও এম. এ ক্লাশে ভর্তি হতে হবে। আবার দু'বছর। তারপর সমস্ত রাজ্যে ছড়িয়ে থাকা স্কুলগুলোর একজন বাংলা বা ফিলজফির মাস্টার মশাই কবে অবসর নেবেন আর তাঁর সেই চেয়ারটির দিকে শকুনের মত তাকিয়ে থাকবে হাজার হাজার বাংলা অথবা ফিলজফির এম. এ., প্রতিবছর যাদের সংখ্যা বেড়েই চলেছে। দু-চারজনের কপালে শিকে ছিঁড়তে পারে, বাকিরা ঢুকে যায় কেরানির চাকরিতে তাও ভাগ্য সহায় থাকলে। ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর অথবা ভাষার ইতিবৃত্ত পড়ে কি লাভ হল ছেলেটির? প্রশ্ন করলে উত্তর একটাই, জ্ঞানার্জনের জন্যে পড়াশুনা। নিজেকে শিক্ষিত করতে, ঐতিহ্য বহন করতে এই শিক্ষানবিশী। পেটে যার ভাত নেই তাকে দিনরাত রবীন্দ্রসংগীত গাইতে বলার মত ব্যাপার। আসলে স্কুলের পর পাঁচবছর এত হাজার হাজার ছেলেকে ভুলিয়ে রাখা গেল, এটাকে যারা লাভ বলে মনে করেন তাঁদের কাছে মুরগি আর কুকুরের মাংসের কোন পার্থক্য নেই। বিকেলবেলায় চমৎকার চপ কাটলেট ভেজে হাসিমুখে খদ্দেরের প্লেটে ধরে দিতে অসুবিধে হয় না।

দেখে শুনে মনে হয় আমরা শালা কুত্তার থেকেও অধম। রাস্তার ঘেয়ো কুত্তার কথা বলছি না। বাড়িতে বাড়িতে যেসব কুত্তা আদরে মানুষ হয় তারা আমাদের থেকে ঢের ভাল আছে। আমার এক মাসতুতো বোন তার কুকুরকে কাঁটামাছ খেতে দেয় না, গলায় কাঁটা ফুটে যাবে বলে। বমি বা পায়খানা করলে আদুরে গলায় ধমক দেয়, 'নো কিটি নো। তোমাকে কতবার বলেছি এসব খেলে টয়লেটে যাবে। লোকে দেখলে বলবে তোমাকে আমি কিছুই শেখাইনি।' এইসব বলতে বলতে সে যখন বস্তুগুলো পরিষ্কার করছে তখন তার কিটি পাশে বসে লেজ নাড়ছে কান ঝুলিয়ে প্রসন্ন মুখে।

এই যে আমি কুত্তার সঙ্গে নিজেদের তুলনা করলাম, এটা আমার ভাল লাগল না। মুশকিল হল, কারও সঙ্গে যে কথা বলে না তার মনে সবসময় কথার খই ফোটে। আমি কেন বেঁচে আছি এ প্রশ্নের উত্তর আমার জানা নেই, কিন্তু উত্তরটা

আমি সবসময় খোঁজার চেষ্টা করি। আর এই চেষ্টার জন্যে মনে হরেক রকম ভাবনা চুলকে ওঠে। কুত্তা-ভাবনাটা সেই কারণেই।

আমি এম. এ. পাশ করেছিলাম বাংলা নিয়ে। বাংলাদেশের মানুষ একুশে ফেব্রুয়ারিকে শহিদ দিবস হিসেবে শ্রদ্ধা করে। তাঁদের চেষ্টায় বাংলা ভাষা আজ পৃথিবীর অন্যতম স্বীকৃত ভাষা। ওরা যে ভাষার জন্যে জীবন দিয়ে হাততালি পায় আমি সেই ভাষায় এম. এ. পাশ করে জুতোর সুখতলা ক্ষইয়েছি এতদিন। এটাকে কি বলব? কলকাতায় যখন কেউ কেউ একুশে ফেব্রুয়ারি পালন করে তখন তাদের ভণ্ডামি দেখে পিত্তি জ্বলে যায়!

হ্যাঁ, শব্দটা এতক্ষণে মাথায় এল। আমি আমার চারপাশে শুধু একের পর এক ভণ্ড দেখে যাচ্ছি। এত ভণ্ড একসঙ্গে বাস করে কি করে? এখন মনে হয় এই প্রশ্নটা করাও বোকামি। অন্ধদের দেশে তাঁরা তাঁদের মত করে বেঁচে ছিল। একজন চক্ষুষ্মান সেখানে হাজির হয়ে নানান অসঙ্গতি দেখে মানিয়ে উঠতে পারছিল না। শেষ পর্যন্ত সে চোখ বন্ধ করে ফেলতেই সব কিছু সহজ হয়ে গেল তার কাছে।

এদেশে বাস করতে হলে সবাইকে ভণ্ড হয়ে থাকতে হবে। মুখে এক কথা, মনে আর এক, কাজ করব যা ভাবব অন্য। এ না হলে তোমার টায়ার পাংচার। আমার বাবা রাজনীতি করেন। গত কুড়ি বছর শাসকদলের হয়ে কাজ করছেন। নীচের দিকের কমিটি ডিঙ্গিয়ে পার্টির ওপর দিকের কমিটিতে পৌঁছে গিয়েছেন। এখন তাঁর হাতে দলের অনেক কিছু দায়িত্ব। কিন্তু তিনি কখনও নির্বাচনে দাঁড়াবেন না। একটা ভেজা কাককেও দলের নমিনেশন পেলে তিনি নির্বাচনে জিতিয়ে আনতে পারেন তবু নিজে দাঁড়াতে চাইছেন না। এই ব্যাপারটাকে লোকে বেশ শ্রদ্ধার সঙ্গে দ্যাখে। পার্টির জন্যে নিজেকে উৎসর্গ করতে ক'জন পারে?

এই ভদ্রলোক চাকরি করতেন কর্পোরেশনে। কুড়িবছর আগে যখন দল ক্ষমতায় আসেনি তখন উনি এগারটার মধ্যে অফিসে যেতেন। দল ক্ষমতায় এলে তাঁর উপর এত চাপ পড়ল যে তিনি একটার আগে সেখানে পৌঁছতে পারতেন না। কোন কোনদিন সেটাও সম্ভব হত না। অথচ মাইনেপত্তর ঠিকঠাকই পেতেন। সেসময় বাড়িতে আর একধরনের লোক আসত। তাদের কেউ কেউ কর্পোরেশনের কর্মচারী, বাকিরা কর্পোরেশনের অনুগ্রহ পেতে আগ্রহী। আড়াল থেকে কথাবার্তা শুনে মনে হত, বাবার হাতে একটা বিশেষ চাবি আছে যা দিয়ে তিনি যে কোন ইচ্ছার দরজা খুলে দিতে পারেন। তা এই করতে করতে বাবা যখন আরও

ওপরতলায় উঠে এলেন তখন নিজের যা প্রাপ্য বুঝে নিয়ে চাকরি ছেড়ে দিলেন। অবশ্য আমার একভাই একবোন কর্পোরেশনে চাকরি করছে। সল্টলেকে দু-দুটো ফ্ল্যাট ভাড়া খাটছে। হ্যান্ডলুমের পাজামাপাঞ্জাবি বাবা শরীর থেকে নামাননি। আমাদের সংসারের খরচ যেমন চলছিল তেমনই চলছে। এখন শুধু সকাল হলেই বাইরের ঘরে ভিড়। এলাকার ভাড়াটে বাড়িওয়ালা, কারখানার মালিক শ্রমিক থেকে রাজ্যের গোলমাল ঢেউ-এর মত বাবার পায়ে এসে আছড়ে পড়ছে এবং তিনি সেগুলোর সুরাহা করে দিচ্ছেন।

বছর তিনেক আগে কাগজে খবর পড়ে কৌতূহল হয়েছিল। বিখ্যাত এক গুরুদেব এসেছিলেন কলকাতার উপকণ্ঠে। দেখতে গিয়েছিলাম। তখন বিকেলবেলা। বাস থেকে নেমে জিজ্ঞাসা করতেই লোকে উৎসাহ নিয়ে দেখিয়ে দিল। বাড়ির সামনে খুব ভিড়। পাগলের মত লোকে ঢুকতে চাইছে। স্বেচ্ছাসেবক ও পুলিশ সেই ভিড় সামলাচ্ছে। শেষ পর্যন্ত লাইন করে দেওয়া হল। অতবড় লাইন আমি ইডেন গার্ডেনেও দেখিনি। লাইনে দাঁড়িয়ে ক্রমাগত শুনে গেলাম বাবার অযৌক্তিক কাহিনীগুলো। ক্যানসার তো বটেই এখন নাকি উনি এইড্সও সারিয়ে দিচ্ছেন স্পর্শ করে। বুঝতে পারলাম লাইনের বেশিরভাগ মানুষ কঠিন অসুখে ভুগছেন অথবা অসুস্থদের প্রতিনিধি হয়ে এসেছেন। তিনঘন্টার অপেক্ষা আমাকে পৌঁছে দিল যে ঘরে সেখানে ষণ্ডামার্কা স্বেচ্ছাসেবকরা রয়েছে। বাড়ির ভেতর থেকে একটা দড়ি দরজা গলে ওঘরে ঢুকে টেবিলের ওপর রয়েছে। আমার আগের মানুষটি সেই দড়ি ধরে তাঁর প্রার্থনা নিবেদন করছে করুণ গলায়। তিরিশ সেকেণ্ড হওয়া মাত্র জোর করে তাকে বের করে দিয়ে স্বেচ্ছাসেবক বলল, 'তিরিশ সেকেণ্ড! তিরিশ সেকেণ্ডে যা বলার বাবাকে বলে দিন।'

'তিনি কোথায়?' আমি অবাক!

'আরে! ওই দড়িটা দেখছেন না?'

'কিন্তু এটা তো বাবা নন?'

'যাচ্চলে। কোথায় থাকো তুমি।' দ্বিতীয়জন বলল, 'ওই দড়ির প্রান্ত বাবা দোতলার ঘরে বসে বাঁ পায়ে ছুঁয়ে আছেন। ওটা ধরলেই বাবা তোমাকে টের পেয়ে যাবেন।'

'টেলিফোনের লাইনের মত কথা বলা যাবে?'

'আরে, বলবে তো বল নইলে কেটে পড়।'

আমি দড়িটা ধরে জোরে টান মারলাম কিন্তু ওটা বেশ শক্ত আর নাড়ানো

গেল না। মনে হল ওই দড়ির প্রান্ত ওপাশে, চোখের আড়ালে কোন শক্ত খুঁটিতে বাঁধা রয়েছে। ততক্ষণে আমাকে ঠেলে সরিয়ে দেওয়া হল। আমার পরের লোকটি হামলে পড়ল দড়ির ওপর।

গুরুদেব সে-সময় কি করছেন কেউ জানে না, শুধু ওই দড়ি ধরে বৈতরণী পার হবার জন্যে যে আকুলতা ভক্তদের মধ্যে দেখেছি তাতে নিজেকে জুতোতে ইচ্ছে করছিল। এঁরাই আমাদের বাবা কাকা দাদা জেঠা। এঁদের সঙ্গেই আমরা বাড়িতে বাড়িতে বাস করি শ্রদ্ধা নিয়ে। চমৎকার।

ইদানীং আমার বাবা সেইরকম গুরুদেবের ভূমিকা নিয়ে ফেলেছেন। ওপরতলায় উঠলেই ক্ষমতা আসে হাতে, আর ক্ষমতা এলেই চামচে জুটে যায়। বাবারও জুটেছে। তারা পার্টিরই কর্মী। ওপরে ওঠার ইচ্ছে যতটা গুছিয়ে নেবার সাধ তার চেয়ে ঢের বেশি। লোকজন জেনে গেছে বাবা প্রসন্ন হলে এম. এল. এ হতে বাধ্য, রাইটার্স থেকে ফাইল নড়বে দূরের কথা, যাকে বলে ছুটবে, ঠিক তাই। কিন্তু ইদানীং তারা আমার বাবার দর্শন পাচ্ছেন না। এত লোকের সঙ্গে জনে জনে কথার.বলার মত সময় তাঁর নেই। অতএব চামচেরা স্ক্রুটিনি করে। স্তোক দেয় অথবা কাটায়। যাঁর ভাগ্য খুব ভাল তিনি বাবার দর্শন পান। আগে বাবা বসতেন আমাদের বাইরের ঘরে। এখন আর একটি ভেতরের ঘরের দরকার হয়েছে আর্শীবাদধন্যদের সঙ্গে কথাবার্তা বলার জন্যে। কিন্তু এসব চলে ভোর থেকে সকাল পর্যন্ত। তারপরেই বাবা বেরিয়ে যান গণতান্ত্রিক কর্মধারা রূপায়ণের জন্যে।

এম. এ. পাশ করার পর বাবা আমাকে ডেকে বলেছিলেন। ভদ্রলোক এত ব্যস্ত যে আমার সঙ্গে আলাদা কথা বলার সময় তাঁর ছিল না। ভাই বোনের সঙ্গেও একই অবস্থা। ডাক পড়েছিল মধ্যরাত্রে। বাড়ি ফিরে স্নান করে উনি আহ্নিকে বসেন। শব্দটা বাবাই ব্যবহার করেন। রাত এগারোটার পরে কেউ ডাকতে এলে চাকরকে বলে দেন, 'এখন আমি ব্যস্ত, আহ্নিকে বসেছি, কাল আসতে বল।' বাবা আহ্নিক সারেন দু পেগ শীভাস রিগ্যাল আর আটটা কাজুবাদামে। সেই কর্পোরেশনে চাকরি করার সময় থেকেই এই পরিমিতিবোধ বাবার ছিল। তখন দু'পেগ ডি. এস খেতেন। একটু একটু করে ডি. এস থেকে প্রিমিয়ামে উঠলেন। এখন ইন্ডিয়ান প্রিমিয়াম হুইস্কি বাতিল করে স্কটল্যান্ডের প্রিমিয়ামে অবস্থান করছেন। তবে কখনই দু'পেগের বেশি নয়। সারাদিন খাটাখাটনি, টেনসনের পর দু'পেগ হুইস্কি খেলে নার্ভ ভাল থাকে। হার্টও সক্রিয় হয়। বাবা

এবং তাঁদের মহান নেতারও নাকি ওই অভ্যেস আছে। সত্যি কথা, তিরাশি-চুরাশিতেও ভদ্রলোকের ছবি দেখলে মনে হয় সত্তর পার হননি। ওই বয়সে ভদ্রলোক যেরকম পরিশ্রম করেন তা একটা তিরিশ বছরের ছেলে করলে ক'দিনেই হাঁপিয়ে উঠবে। বাবা তাঁর এই মহান নেতাকে অনুসরণ করছেন অন্ধভাবে। ইদানীং বাবার কথাবার্তাও ওই ভদ্রলোকের মতো হয়ে গিয়েছে।

আমার তখন ঘুম পাচ্ছিল। ভাবলাম বলে দিই এখন যেতে পারব না। তারপরই মনে হল অনেককাল বাবার সঙ্গে কথা বলিনি, উনিও ডাকেননি। তাছাড়া এরকম একটা ডাকের জন্যে দর্শনপ্রার্থী জনগণ যখন হাঁ করে বসে থাকে তখন আমি কি এমন্ হরিদাস যে ফিরিয়ে দেব?

গেলাম। বালিশে হেলান দিয়ে লুঙ্গি পরে খালি গায়ে বাবা বসেছিলেন। অনেককাল পরে বাবাকে খালি গায়ে দেখলাম। একটু রোগা রোগা মনে হল। লোকটাকে খুব খাটতে হচ্ছে।

'এসো। বসো, উঠে বসো। হ্যাঁ, বিছানাতেই বসো।' বাবা সামান্য সরলেন।

'না। ঠিক আছে।' আমার মুখ থেকে বেরিয়ে এল।

'তুমি তো এম. এ. পাশ করলে। এবার কি করবে ঠিক করেছ?'

'কিছুই ঠিক করিনি।'

'কেন?'

'আমি ঠিক করলেই সেটা করা যাবে কিনা তাতো জানি না।'

'আঃ, বড্ড পেঁচিয়ে কথা বল। তোমার মায়ের স্বভাব ছিল এইরকম।'

'আমি তো মায়েরই ছেলে।'

'মায়ের ছেলেরা কখনও বড় হয় না। হ্যাঁ। কলেজ সার্ভিস কমিশনে নাম লিখিয়েছ?'

'এখনও ওরা নাম চায়নি।'

'তোমার কলেজে পড়ানোর ইচ্ছে আছে তো?'

'আমি ঠিক বুঝতে পারছি না।'

'স্ট্রেঞ্জ! তাহলে বাংলা নিয়ে এম. এ পাশ করলে কেন?'

'চাকরি করব বলে পড়িনি।'

'বাঃ। তা যখন পড়েই ফেলেছ তখন বিদ্যেটাকে কাজে লাগাও। ছেলেমেয়েদের শেখাও।'

'এই বিদ্যে শেখাবার জন্যে এম. এ. পড়ার দরকার হয় না। বাড়িতেই পড়া

যায়।'

বাবা আমার দিকে তাকালেন। আমি তখনও দাঁড়িয়ে ছিলাম। তিনি গ্লাস শেষ করে তাঁর কোটা অনুযায়ী দ্বিতীয়বার ঢাললেন। জল মেশাবার সময় লক্ষ্য করলাম তাঁর চোখ খুব সতর্ক। ঠিক পরিমাণ মত জল ঢেলে জাগটা ট্রের ওপর রেখে একটা কাজু মুখে পুরলেন, 'তোমার কথা শুনে আমি একটুও রাগ করিনি। এসো, এখানে বসো। কাম।'

অগত্যা বসতে হল। মায়ের সঙ্গে আমার সম্পর্ক খুব ভাল ছিল। ছেলেবেলায় দেখেছি মা বাবার জন্যে রাত জেগে বসে থাকতেন। তখন বোধহয় সংসারে খুব টানাটানি ছিল। দেশ-উদ্ধার করে এসে বাবা খেতে বসতেন চোরের মত। প্রায়ই দেখেছি মায়ের খাবার কিছুই থাকত না। আর তখন মনে হত ওই লোকটা মায়ের খাবার খেয়ে নিয়েছে বলে মা খেতে পেল না। তখনও বাবার নিয়মিত রাতের আহ্নিক শুরু হয়নি। কর্পোরেশনের এ্যাসেসমেন্ট সেলে বদলি হবার পর থেকেই বাড়ির হালচাল পাল্টালো। দু'বেলা আমিষ পড়তে লাগল পাতে। এবং বাবা তাঁর আহ্নিক শুরু করলেন। কিন্তু মা হয়ে গেলেন আরও চুপচাপ।

বিছানায় বসার পর বাবা গ্লাসে চমুক দিয়ে বললেন, 'কাল থেকে তুমি পার্টি অফিসে যাবে। তোমাকে সবাই চেনে, তুমি এবার চেনাজানা করে নাও।'

'কেন?'

'আমার ছেলে হয়ে তোমার সঙ্গে পার্টির কোন সংযোগ নেই এটা ভাল দেখায় না, তাই।'

'সেটা কি অন্যায়?'

'ন্যায়-অন্যায় জানি না। আমি যখন সমস্ত গণতান্ত্রিক মানুষকে আমাদের পতাকার নীচে সামিল হতে উদ্বুদ্ধ করছি তখন প্রশ্ন উঠতে পারে, নিজের ছেলের ক্ষেত্রে কেন পারিনি?'

'এর উত্তর তো আপনার জানা আছে।'

'জানা আছে? নাঃ, আমি জানি না!'

'যিনি আপনার আদর্শ বলে শুনেছি তিনি তো তাঁর ছেলেকে পার্টিতে নিয়ে যেতে পারেননি। নিশ্চয়ই তাঁকেও এ ব্যাপারে কৈফিয়ৎ দিতে হয়েছে। সেই কৈফিয়ৎই কোট করবেন।'

'মাই গড!' বাবা চমকে উঠলেন।

'আমি ভুল বললে বলুন সংশোধন করে নেব।'

'তুমি কার সঙ্গে নিজের তুলনা করছ জানো? ওর মত কর্মক্ষমতা থাকলে তুমি এম. এ পাশ করে বেকার বসে থাকতে না।' বাবা হঠাৎ রেগে গেলেন।

'আমি কারও সঙ্গে নিজের তুলনা করছি না। কৈফিয়ৎ দেবার কথা উঠল বলে বললাম।'

কয়েক সেকেণ্ড লাগল বাবার, নিজেকে আগের জায়গায় ফিরিয়ে আনতে। বললেন, 'তোমাকে নিয়ে আমার অনেক পরিকল্পনা আছে। দ্যাখো, এতকাল রাজনীতি করছি। রাজনীতির জন্যে চাকরি ছাড়লাম। এখন পার্টির কর্মী হিসেবে কাজ করে যাচ্ছি। তুমি হয়তো জানো আমাকে অনেকবার ইলেকশনে দাঁড়াতে বলা হয়েছে কিন্তু আমি আড়ালেই থাকতে চাই। তবে সততার তো একটা মূল্য আছেই। সেই কারণেই পার্টিসূত্রে কিছু ক্ষমতা আমি পেয়েছি। এখন দেখছি মাঝারি শ্রেণীর নেতাদের ছেলেরা ঝটপট মাথা উঁচু করে দাঁড়াচ্ছে। তুমি বেলগাছিয়ায় যাও অথবা টালিগঞ্জে, শুনবে অমুক নেতা বা মন্ত্রীর ছেলে যা বলবে তাই হবে। এইসব ছেলের সঙ্গে পার্টির যোগ কিন্তু খুব কম। যেদিন বাবা থাকবে না সেদিন তাদেরও দিন শেষ। এই ভুলটা আমি তোমার ক্ষেত্রে করতে চাই না। তাছাড়া আমি তোমাকে একেবারে তৃণমূল থেকে উঠতে বলছি না। তার প্রয়োজনও নেই। তোমার ভূমি তৈরি আছে। এম. এ. ডিগ্রিটা কাজে লাগবে। ওটা তুমি চাকরি করার জন্যে অর্জন করোনি। পার্টিতে তোমার স্ট্যাটাস বাড়াবার জন্যে ব্যবহার করো। আমাদের বেশিরভাগই তো অশিক্ষিত। কয়েকজন শিক্ষিত মানুষ তাই লাঠি ঘোরাতে পারে সহজেই।'

'আপনি কি বলতে চাইছেন বুঝতে পারছি না।'

'খুব সহজ। পার্টির সঙ্গে সংযোগ রাখলে তোমাকে ওপরের দিকের কোন সেলে প্লেস করতে আমার অসুবিধা হবে না। অধ্যাপনা করতে চাইলে কলেজ সার্ভিস কমিশনের প্যানেলের প্রথম দিকে তোমার নাম থাকবে।'

'আর না চাইলে?'

'হ্যাঁ। এটাই আমি চাইছি। অধ্যাপনা করলে জীবন একটা জায়গায় আটকে থাকবে। অর্থ, বল, সম্মান সব একই জায়গায় পাক খাবে। আমি সেটা চাই না। দ্যাখো, আমাকে কেউ কখনও সাহায্য করেনি। আমি যা করেছি নিজের চেষ্টায় করেছি। কিন্তু এই করাটা এত সামান্য যে, যাক গে, আমি চাই, তুমি আমার থেকে শুরু করো।'

'কি রকম?'

'দু'জন নন রেসিডেন্ট ইন্ডিয়ান আমাকে ব্যক্তিগতভাবে এ্যাপ্রোচ করেছেন। তাঁরা ইনভেস্টমেন্ট করতে চান। একজন মাছের বিভিন্ন আইটেম টিনে প্যাক করে বিদেশে পাঠাবেন আর একজন টেক্সটাইলের কারখানা করবেন। কিন্তু ওঁদের কোন এস্টাব্লিশমেন্ট এদেশে নেই। তুমি ওয়ার্কিং পার্টনার হয়ে এঁদের সঙ্গে যোগ দেবে। প্ল্যান, প্রোগ্রাম যা কিছু ইঞ্জিনিয়াররাই করবে, তুমি শুধু সেটা এক্সিকিউট করবে। ব্যাপারটা রপ্ত করতে তোমার বেশি সময় লাগবে না। কিন্তু তার আগে তোমাকে পার্টির লোক হতে হবে। কয়েক মাস যাওয়া আসা, মিছিল করা, স্লোগান দেওয়ার ব্যাকগ্রাউন্ড থাকলে তোমাকে পুশ করতে আমার অসুবিধে হবে না। এদেশে ব্যবসা করতে গেলে প্রথম সমস্যা হল শ্রমিক সমস্যা। তুমি যদি শ্রমিকদের একজন বলে নিজেকে আগেই চিহ্নিত করতে পারো, তাহলে ওই সমস্যা মাথা চাড়া দেবে না। দ্বিতীয়ত, সরকারি লালফিতের ব্যাপার। ওর জন্যে আমি আছি। তাই তোমাকে নিলে যারা টাকা ঢালবে তারা বিস্তর উপকৃত যেমন হবে, তেমনি তোমারও ওপরে ওঠার দরজা একটার পর একটা খুলে যাবে।'

আমি উঠে পড়লাম। উনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'কোথায় চললে?'

আমি কথা বলতে পারছিলাম না। ইশারায় ওঁনাকে অপেক্ষা করতে বলে প্রায় দৌড়ে পাশের টয়লেটে ঢুকে পড়লাম। আলো জ্বেলে বেসিনের ওপর ঝুঁকে পড়তেই হড়হড় করে বমি বেরিয়ে এল। বেশ কিছুক্ষণ ধরে পাক খাচ্ছিল এগুলো, এখন মুখে তেতো স্বাদ নিয়ে হাঁপাতে লাগলাম। কল খুলে জল মুখে নিয়ে স্বস্তি ফিরছিল না। আজকাল এটা হচ্ছে। কেন হচ্ছে বুঝতে পারি না। যখন হয় তখন আচম্বিতেই হয়। মুখ মুছে ঘরে ফিরে আসতেই প্রশ্ন হল, 'কি হয়েছে?'

'বমি।'

'সেকি। কি খেয়েছিলে? বদহজম হয়েছে নাকি?'

'না। তার জন্যে নয়।'

'তাহলে?'

'আজকাল এমন হয়।'

'তাই নাকি। কালই হরেন ডাক্তারের কাছে যেও, লিভারে কিছু হল নাকি।'

'শরীর ঠিক আছে।'

'আজকাল এমন হয় বলছ আবার শরীর ঠিক আছে, সম্ভব নাকি?'

'বেশি কথা বললে বা শুনলে এমন হয়।'

'কথা বললে বা শুনলে বমি হয় আমি বাপের জন্মে শুনিনি।'

'কেমন ঘেন্না লাগে, গা গুলিয়ে ওঠে আর তারপরই বমি বেরিয়ে আসে। আমি চেষ্টা করেছি কিন্তু কিছুতেই কন্ট্রোল করতে পারিনি।'

বাবার মুখ এবার শক্ত হয়ে গেল, 'আমার কোন্ কথা শুনে তোমার ঘেন্না হল? গা গুলিয়ে উঠল? উত্তর দাও?'

আমি লোকটার দিকে তাকালাম। এই লোকটা আমার বাবা। সেই পুরনো গপ্পোটা তুলে যদি প্রশ্ন করি, 'উত্তরটা দিচ্ছি। কিন্তু তার আগে প্রমাণ করুন আপনি আমার বাবা! তাহলে কি জবাব দেবেন?'

'তাকিয়ে আছ কেন? কি জিজ্ঞাসা করলাম শুনতে পাওনি?'

'পেয়েছি। কিন্তু আমার উত্তর দিতে ইচ্ছে করছে না।'

'ইচ্ছে করছে না? তুমি এত বড় উদ্ধত?'

'আমাকে ভুল বুঝবেন না। আমি এ বিষয়ে কথা বললে আবার বমি করে ফেলব।'

'স্ট্রেঞ্জ।' বাবার চোখমুখ দেখবার মত। হাতের গ্লাসের দিকে তাকালেন, 'এর গন্ধ সহ্য হচ্ছে না, এমন তো হতে পারে। তোমার মায়ের হতো না।'

'মায়ের সব অভ্যেস আমি পাইনি।'

'সেটা তো দেখতেই পাচ্ছি।'

'আসলে, আপনার আলমারির সব বই আমি পড়েছি।'

'বই? কোন্ বই?'

আমি আলমারিটা দেখলাম। ওটা বই-এ ঠাসা। মার্কস সাহেব থেকে আরম্ভ করে অশোক মিত্র, বাবার সংগ্রহ চমৎকার। কোন কোন বই পড়ার সময় বুঝেছি আমার আগে কেউ তার পাতা উল্টে দ্যাখেনি। বাবা চোখ ছোট করলেন, ' তো?'

'ওগুলো পড়লে যে ধারণা তৈরি হয় তার সঙ্গে আপনাদের কাজের কোন মিল নেই। অথচ ওগুলো থেকে কিছু শব্দ নিয়ে বাক্য তৈরি করে আপনারা এমন একটা বাতাবরণ তৈরি করেছেন যে—আমার আর কথা বলতে ভাল লাগছে না।'

'না। পালিয়ে যেতে দেব না তোমাকে। বলো, কি বলতে চাও?'

'আপনি আমাকে পার্টি করতে বলছেন সুবিধে আদায় করার জন্য। আপনাদের দলের বেশিরভাগ নেতার ছেলে বেআইনি পথে টাকা রোজগার করে বড়লোক হয়েছে। বাবার ইনফ্লুয়েন্স আর সেই সুবাদে সঙ্গে মাস্তান রেখে চললে টাকা আপনি আসে। আর আপনার নেতার ছেলে পার্টি থেকে বহু দূরে থেকেও এদেশে যা ইচ্ছে তাই করতে পারে। এমন কি তার কোম্পানিতে কেন লকআউট ক্লোজার

হয়, তা নিয়ে আপনাদের শ্রমিকদরদী নেতারা কোন প্রশ্নও করে না। আপনি সেই ভুলটা করতে চান না বলে আমার ওপর পার্টির সাইনবোর্ডটা টাঙিয়ে রাখতে চান? আপনারা পার্টি করেন টাকা রোজগারের ধান্দায়। ওপরের তলার নব্বুইভাগ নেতার বেআইনি সম্পত্তি আছে। এই, আপনি দু-দুটো বেআইনি ফ্ল্যাটের মালিক। ওইসব বই-এর লাইন আপনাদের দেখে এখন লজ্জা ভয়ে কুঁকড়ে থাকে। আপনার উপদেশ শুনলে তাই আমার বমি আসে।'

'যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা। এক পয়সার মুরোদ নেই অথচ জ্ঞান দিচ্ছ আমাকে। শুয়োরের বাচ্চা!' চিৎকার করে উঠলেন তিনি।

'কয়েকজন, খুব অল্প কয়েকটা মানুষ দলে আছে যারা আদর্শে বিশ্বাস করে, মানুষের জন্যে কাজ করতে চায়। দলের অবস্থা দেখে তাদের কেউ কেউ মন্ত্রীত্ব থেকে বেরিয়ে এসেও শেষপর্যন্ত সামান্য কিছু করতে পারবে বলে আপোস করে। এরা আছে বলে এখনও আপনারা সর্বহারা গণতান্ত্রিক ইত্যাদির সাইনবোর্ডটা বহন করতে পারছেন। নইলে আপনাদের সঙ্গে আপনাদের বিরোধীদের কোন পার্থক্য নেই।' বলতে বলতে আবার বমি পেয়ে গেল। আমি টয়লেটে ছুটলাম। শরীর হালকা হতেই মুখে জল দিয়ে আয়নায় নিজেকে দেখলাম। এই আমি, আমার নাম মা রেখেছিলেন বিপ্লব। মা যে কি বোকা ছিলেন!

এই পরিবারের কর্তা যখন বাবা তখন তার ছেলের নাম বিপ্লব? কানাছেলের নাম পদ্মলোচন এর চেয়ে কম হাস্যকর। মায়ের কেন এমন মতিভ্রম হয়েছিল তা তিনিই জানেন।

টয়লেট থেকে বেরিয়ে নিজের ঘরের দিকে যাচ্ছিলাম, এইসময় হুঙ্কার উঠল, 'যাচ্ছ কোথায়? আগে কথা কমপ্লিট কর।'

'আমার কোন কথা নেই।'

'নেই?'

'হ্যাঁ। কারণ আপনি আমাকে শুয়োরের বাচ্চা বলেছেন।'

'তুমি আমার সঙ্গে ইয়ার্কি মারছ?'

'একদম নয়। বলে ভাল করেছেন।'

'ভাল করেছি?'

'হ্যাঁ প্রশ্নটা আমার মধ্যে পাক খাচ্ছিল। নিজেকে জিজ্ঞসা করছিলাম আমি কেন শুয়োরের বাচ্চা হতে পারছি না। কেন আমার এসব দেখলে শুনলে বমি আসে। শুয়োরের বাচ্চাদের তো বমি পায় না। তারা ঘোঁত ঘোঁত করে কাদায়

খাবার খোঁজে, কোন প্রতিবাদ করে না। মানুষের অবস্থা তো একই রকম। বাসে-ট্রামে ওঠার জায়গা নেই তবু ওঠে। আগে এক পয়সা ভাড়া বাড়ানোয় যারা আগুন জ্বেলেছিল প্রতিবাদে, তারাই এখন বিভিন্ন নাম দিয়ে সরকারি বাস বের করে তিনগুণ বেশি ভাড়া নিচ্ছে বেসরকারি বাসের চেয়ে, অথচ কেউ প্রতিবাদ করে না। আলুর দাম মন্ত্রীর কৃপায় হু হু করে বেড়ে গেলেও মুখ বুঁজে লোকে কেনে। পাঁঠার মাংসের দাম একশ' টাকা ছাড়িয়ে গেলে ভাবে তার নিজের মাংস কি ওই দামে বিক্রি হবে? নিউ মার্কেটে শুয়োরের বাচ্চার মাংস বেশ দামী। অথচ মানুষের মাংস কলকাতায় বিক্রি হয় না। হলে তবু! যাকগে। আপনি আমাকে শুয়োরের বাচ্চা বলে কিছুটা সম্মান দিলেন।'

'সম্মান দিলাম? তুমি কি বলতে চাইছ আমি বুঝতে পারছি না ভেবেছ? যেহেতু তোমাকে শুয়োরের বাচ্চা রাগের মাথায় বলে ফেলেছি তাই বার বার বলে বোঝাতে চাইছ আমি শুয়োর। স্কাউন্ড্রেল।'

উনি সত্যি সত্যি ক্ষেপে গেলেন।

'আমি শুয়োরের বাচ্চা হলে আপনাকে শুয়োর ভাবব কেন?'

'যেহেতু আমি তোমার বাবা—!'

'এইটে গোলমেলে ব্যাপার।'

'তার মানে?' ওঁনার চোয়াল আবার ঝুলে গেল।

'আচ্ছা, আপনাকে যদি বলা হয় প্রমাণ করুন, আপনি আমার বাবা তাহলে সেটা প্রমাণ করতে পারবেন? গোলমেলে ব্যাপার নয়?'

'আমাকে প্রমাণ করতে হবে যে আমি তোমার বাবা?'

'যদি বলা হয়! না, পারবেন না। দেখুন, আপনার চেহারার সঙ্গে আমার কোন মিল নেই। মা বলত আমি মামার বাড়ির ধাত পেয়েছি। আপনার স্বভাবের সঙ্গে আমার কোন সাদৃশ্য নেই। আপনি যা ভাবেন আমি তার উল্টো। আমাদের দেখলে পাবলিক কখনই বলবে না আমরা বাপ-ছেলে। মায়ের পেট থেকে পৃথিবীতে এসেছি। সেটা মা তো বটেই, ডাক্তার নার্স সাক্ষী হিসেবে আছে। অতএব আমি মায়ের ছেলে। এ নিয়ে কোন ডিসপুট নেই। কিন্তু কে বাবা তা মা বলে দেয় বলেই তিনি বাবা হন।'

'বাঃ। তোমার বার্থ সার্টিফিকেটে আমার নাম আছে বাবা হিসেবে।'

'ওখানে আপনার বদলে মায়ের কোন বয়ফ্রেন্ডের নাম বললে ওরা সেটাই লিখত।'

'মায়ের বয় ফ্রেন্ড? জুতিয়ে মুখ ছিঁড়ে দেব হতভাগা।'

'আপনি একটু ভেবে দেখলে বুঝতে পারবেন আমি সত্যি বলছি-আর' বলে দাঁড়ালাম না আমি। একটু ভাল লাগছিল গা গুলানো ভাবটা কমে যাচ্ছিল বলে। নিজের ঘরে চলে এলাম। নিজের ঘরের জানালায় দাঁড়াতেই ঠাণ্ডা বাতাস গায়ে লাগল। রাত বাড়লে বাতাসের চরিত্র খারাপ হয়? ওই ভদ্রলোক আমাকে ব্যবহার করতে চাইছেন। নিজে দু'হাতে কামিয়ে চলছে না, আমাকে এন. আর. আইয়ের সঙ্গে ভিড়িয়ে মাল খিঁচতে চান। ওই ওঁর নেতার সম্পর্কে পাবলিক একই কথা বলে। ছেলেকে হরেক রকম কোম্পানি করে দিচ্ছেন ভদ্রলোক বিদেশিদের সঙ্গে কোলাবরেশনে, তার এক একটার নাভিশ্বাস অল্প কয়েক বছরেই উঠে যাচ্ছে। কিন্তু, লোকে বলে, ছেলে তার অর্জিত কালো টাকা সুইস ব্যাঙ্কে রেখে আসছে। আর উনি বছরে দু' বার এন. আর. আই. খোঁজার নাম করে ব্যাঙ্কের এ্যাকাউণ্ট চেক করে আসেন।

আজ আমার ঘুম আসছিল না। হঠাৎ চোখে পড়ল মহিলাটিকে। ঠিক উল্টোদিকের ফ্ল্যাট। আমার দিকে তাকিয়ে হাসছেন। আমি দেখতে পেয়েছি বুঝে হাত নেড়ে বললেন, 'ঘুম আসছে না?'

আমি না বুঝে মাথা নাড়লাম। হ্যাঁ। তিনি গলা তুললেন, 'আমারও।'

আমি ঝটপট সরে এলাম। এরকম কেস জীবনে শুনিনি। ওই বাড়িটা নতুন হয়েছে। সবকটা ফ্ল্যাট বিক্রি হয়ে গেছে তৈরি হবার আগেই। ওই মহিলাকে কখনও দেখিনি। ভদ্রমহিলা কারো দিকে তাকিয়ে কি হাত নাড়ছেন? নাকি এদিকে অন্য কেউ আছে। আমি একতলায় আর উনি দোতলায়। তাকিয়ে আছেন এদিকেই। অতএব আমিই ওঁর লক্ষ্য। আমার ঘুম আসছে কি আসছে না জেনে উনি কি করবেন? কি লাভ?

সরে এলাম জানলা থেকে।

আজ আমার খুব ভাল লাগছে। যাঁকে বাবা বলি, জ্ঞান হবার পর থেকে বলে এসেছি বলেই বলি, তাঁকে কথাগুলো বলতে পেরে আনন্দ লাগছে। আচ্ছা, মানুষ কত সহজে আনন্দিত হয়, না? অথচ ওই ভদ্রলোকের আহ্নিকের আরাম আজ ঘুচলো। এখন উনি কি করতে পারেন? আমাকে, বড়জোড় এ বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিতে পারেন। আমার মাসিক আয় এখন আটশো টাকা। দিব্যি চলে যায়। কলেজ স্ট্রিটের এক প্রকাশকের নতুন বই-এর প্রুফ দেখি আমি। এই হল্ল বিপ্লবকুমারের বিপ্লব। আটশো টাকায় থাকা-খাওয়া যায়?

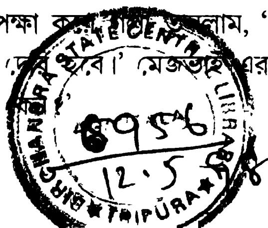
আলো নিবিয়ে শুয়ে পড়লাম। একটা জিনিস লক্ষ্য করেছি অনেকেই ঘর অন্ধকার হলে চমৎকার ঘুমিয়ে পড়েন। আমার আবার উল্টো। অন্ধকার আমার মনে হাজারটা সমস্যা স্প্রে করে। সেগুলো মুছতে রীতিমত লড়াই করতে হয়।

আজকাল কিছুতেই ভোরবেলায় আমার ঘুম ভাঙে না। ওদিকে রাত হয় বলেই হয়তো—। আজও সাড়ে আটটায় বিছানা ছাড়লাম। ব্রাশে পেস্ট নিয়ে কেন জানি না জানলার সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। চোখ পড়ল সামনের দোতলায়। কেউ নেই সেখানে। কিন্তু এদিকে বাড়ির সামনে ভিড় জমেছে। বাবার দর্শন পেতে আগ্রহীরা ইতিমধ্যেই জড়ো হয়ে গেছে। আচ্ছা, ভদ্রলোক কি গতরাত্রে ঘুমিয়েছিল? ওঁর মনে কি একবারও মায়ের চরিত্র সম্পর্কে সন্দেহ এসেছিল? আমার মায়ের চরিত্র কিরকম ছিল? মায়ের মুখ মনে পড়ল। সাধারণ আটপৌরে সহজ সরল বাঙালি মেয়ের মুখ। যাদের জীবনে স্বামীপুত্রকন্যা ছাড়া আর কোন চিন্তা নেই, পরপুরুষের সঙ্গে দূরকথা, নিজের স্বামীর সঙ্গেই যাঁদের প্রেম করা হয়ে ওঠে না। হয়তো শারীরিক আনন্দও একটা অভ্যেসের মধ্যে সীমিত। আমার মায়ের চরিত্র এতই আটপৌরে যে ওই ভদ্রলোকের সন্দেহ লবণের লাড্ডু হয়ে যাবে এবং সেটা তাঁকেই গিলতে হবে। আচ্ছা, মা কেন বেঁচেছিলেন? যদি জন্ডিসে মারা না যেতেন তাহলে এতকাল কি কারণে বেঁচে থাকতেন? শুধু স্বামীর সঙ্গে সহবাসে পাওয়া সন্তানগুলোকে বড় করার জন্যে? দু'বেলা রান্নাঘরে কাটিয়ে প্রত্যেকের মুখে আহার তুলে দেবার জন্যে? একে তো একধরনের মানুষ সেবা বলে থাকেন। তা সেই সেবা করে জীবন ফুরিয়ে দিতে যারা উৎসাহ যোগান, মহীয়সী আখ্যা দেন, তাদের মত ক্রিমিন্যালদের গুলি করে মারা যায় না? আর এই সব নির্বোধ রমণীদের যাদের জ্ঞানচক্ষু ফোটালেও ফুটবে না, জন্মমাত্র কেন জন্ডিস হয় না? ম্যালিগন্যান্ট জন্ডিস!

পিতৃদেবের ঘরের গায়ে তাঁর নিজস্ব টয়লেট বাথরুম রয়েছে। কিন্তু আমাদের সবার জন্যে বাথরুম কমন। টয়লেট তার মধ্যেই। বাড়িটা যেহেতু পুরোন ধরনের তাই এই ব্যবস্থা। এখনও এ বাড়ির কল ঘরে চৌবাচ্চা আছে। চৌবাচ্চার বিলাসিতা দক্ষিণ কলকাতার ফ্ল্যাট বাড়িতে আজকাল ভাবা যায় না।

কলঘরের সামনে পৌঁছে দেখলাম ওটার দরজা বন্ধ। এই এক জ্বালা একটু অপেক্ষা করে [illegible]লাম, 'ভেতরে কে? তাড়াতাড়ি কর।'

'দেরি হবে।' মেজভাই-এর গলা।



'এইমাত্র ঢুকেছি। অফিস যেতে হবে।'

অতএব অপেক্ষা করা ছাড়া কোন উপায় নেই। নেই কেন? মনে পড়তেই দোতলায় উঠে এলাম। ভদ্রলোক ঘরে নেই। এখন তিনি নীচের দরবারে আসীন। ওর বাথরুমে গিয়ে পরিষ্কার হলাম। এখানে আসা আমাদের অভ্যেস নেই, বোধহয় এক্তিয়ারেও। কিন্তু আজ মনে হল, কেন আসব না? এই বাথরুম টয়লেট তো বাড়ির বাইরে নয়।

সকালে এক কাপ চা আর দুটো টোস্ট আমার বরাদ্দ। সকালে এর চেয়ে বেশি খেতেও ইচ্ছে করে না। এখন আমাদের রান্নাঘর ঠাকুর সামলায়। লোকটা রোজ ফুলে ফেঁপে উঠছে। কিন্তু কিছু করার নেই। কেন জানি না, ঠাকুর আমাকে একটু সমীহ করে চলে। চলুক।

সেজেগুজে পথে নামলাম। সাজগোজ বলতে জিনস আর টি শার্ট। পায়ে চপ্পল। দরজায় তালা দিয়ে দেখলাম তখনও দু' তিনজন পাবলিক বাবার চামচাদের সঙ্গে কথা বলে যাচ্ছে। মানুষের কতরকমের ধান্দা থাকে তা মানুষই জানে না।

রাস্তায় নামবার আগে দোতলায় নজর চলে গেল কোন কারণ ছাড়াই। তখন তাকে দেখতে পেলাম। কাল রাত্রের সেই মহিলা। বয়স কত হবে? আমারই বয়সী। কিন্তু কি আশ্চর্য, চোখাচোখি হতে চোখ সরিয়ে নিল। যেন আমাকে কখনও দ্যাখেনি। উদাস হয়ে তাকিয়ে রইল দূরের বাড়ির দিকে। অথচ গতরাত্রে ইনিই আমাকে হাত নেড়ে প্রশ্ন করেছিলেন। একেই হয়তো নকশা করা বলে। মেয়েদের পক্ষে এমনটা করাই সম্ভব। নিকুচি করেছে।

আমার হাসি পেল। হাঁটতে-হাঁটতেই হাসলাম। আমাদের বাংলা ভাষায় চমৎকার কিছু শব্দ আছে। যেমন এই, নিকুচি। আহা। কী শব্দ। যেমন, ন্যাকামি। করো অনুবাদ। পারবে না। কিন্তু ওই শব্দদুটো কত শত মানে কী স্বচ্ছন্দে বুঝিয়ে দেয়। মোড়ের মাথায় আসতেই হঠাৎ কানে শব্দগুলো ঢুকলো। দুটো বছর বাইশের ছেলে কথা বলছে। ভারতীয় ক্রিকেট টিম কেন একের পর এক ম্যাচ হেরে যাচ্ছে তাই নিয়ে আলোচনা। কিন্তু প্রতি তিনটি শব্দের পর দু অক্ষরের পুরুষাঙ্গ অথবা চার অক্ষরের শব্দ অকাতরে ব্যবহার করে চলেছে জোর গলায়। রাস্তা দিয়ে ছেলেমেয়ে, মহিলা, বৃদ্ধরা যাচ্ছেন কিন্তু ওরা অসাড়। আর যাঁরা যাচ্ছেন তাঁরা ওসব শুনেও যেন শুনতে পাননি এমন ভান করছেন।

আমার মাথাটা ঝিমঝিম করে উঠল। আমি সামনে গিয়ে দাড়ালাম, 'এই যে ভাই, কাজটা কি ঠিক করছেন?'

ওরা হকচকিয়ে গেল। একজন জিজ্ঞাসা করল, 'কেন? অন্যায় কিছু করেছি?'

'আপনারা এতক্ষণ কী বলছিলেন?'

'ক্রিকেট নিয়ে আলোচনা করছি।'

'করছিলেন। কিন্তু সেই সঙ্গে অশ্লীল শব্দ বলছিলেন কেন?'

'অশ্লীল শব্দ? যাঃ বাঁআ। অশ্লীল শব্দ কখন বললাম?'

'এইমাত্র কি বললেন? আপনার লজ্জা করছে না, নিজেই জানেন না কি বললেন। আপনার মা-বোনেদের সামনে বসে ওই কথা যদি কেউ বলত আপনার ভাল লাগত?'

আমি চিৎকার করে উঠতেই ভিড় জমে গেল। কয়েকজন আমাকে টানতে লাগল। একজন বলল, 'ছেড়ে দিন দাদা। এদের বাঁআ বলে কিছু লাভ হবে না।'

আমি অসহায় চোখে লোকটির দিকে তাকালাম। তারপর হাঁটা শুরু করলাম কানে এল, প্রথম ছেলেটি তখনও বিস্মিত গলায় বলে চলেছে, 'কী মাল মাইরি। আমাকে কেন টকরালো তাই বুঝতে পারছি না এখনও।' আফসোস হচ্ছিল। আমি কাদের বোঝাতে যাচ্ছিলাম। জননীদেবী যত ভালবাসা নিয়ে আমার নাম বিপ্লব রাখুন না কেন, আমার ক্ষমতা একটা মাথা নাড়া পুতুলের চেয়ে বেশি নয়। শরীর গুলিয়ে উঠছিল। ট্রাম রাস্তায় গিয়ে দাঁড়ালাম। যদি কোন অলৌকিক উপায়ে ক্ষমতা পেতাম তাহলে এইসব বঙ্গ যুবকদের জিভ কেটে ফেলতাম। হয়তো আশি শতাংশ যুবক বোবা হয়ে যেত কিন্তু তাতে কানের আরাম হত।

তারপরেই মনে হল, আমি অকারণে রেগে যাচ্ছি। এককালে শালা বলাটাও অশ্লীল ছিল, এখন তো নেই। তাহলে?

ট্রামে চেপে কলেজ স্ট্রিট যেতে কতক্ষণ। তারমধ্যেই চোখে পড়ল দুটো মধ্যবয়সী লোক টিকিট না নিয়ে এক টাকা কন্ডাক্টরের হাতে গুঁজে নেমে পড়ল। দু' টাকা কুড়ির বদলে এক টাকা। কন্ডাক্টরের মুখের দিকে তাকালাম। একেবারে বুদ্ধদেবের মুখ। দাড়ি ক'দিন না কামানো সত্ত্বেও ওই মুখে পৃথিবীর কোন পাপ স্পর্শ করেনি।

আমি দাঁড়িয়েছিলাম ভেতরের দিকে। সেখান থেকেই চেঁচিয়ে উঠলাম, 'এই যে দাদা, আপনাকে আট আনা দিলে বিনা টিকিটে যাওয়া যায় বুঝি!'

লোকটি আমার দিকে তাকাল না। নির্বিকার হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল।

এক বৃদ্ধ বললেন, 'এই তো চলে আসছে ভাই। আজ তো নতুন দেখছি না। পঞ্চাশ সালেও এই কাণ্ড হত। এই করে করে বাস-ট্রাম লোকসানে চলছে। যাও

প্রাইভেট বাসে। অনেক কম ভাড়া, কই তাদের তো তবু লোকসান হয় না!'

আর একজন প্রৌঢ় খিঁচিয়ে উঠলেন, 'লোকসান কোথায় নেই বলুন তো? বড় বড় মন্ত্রীরা ঘুষ নিচ্ছে, হাওলা কেস, বোফর্স কেস-এ কত ট্রানজেকশন হয়েছে জানেন? তা এমনি এমনি হয়েছে নাকি? পাবলিককে ঠকিয়ে হয়েছে। দেশের এক নম্বর যদি ঘুষ নেয় তো এই বেচারারা কি দোষ করল।'

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'তাহলে আপনি ওকে সমর্থন করছেন?'

'আলবাত করছি। ক'টাকা মাইনে পায়? ভাড়া বাড়িতে থেকে বাজার করে খেতে গেলে ওর ওই মাইনেতে ক'দিন চলবে? অ্যাঁ! এই যে বাজারে দ্যাখেন, একশ' টাকা মাংস, দেড়শো টাকা ইলিশ হু হু করে পাবলিকের ব্যাগে ঢুকে যাচ্ছে কোন রোজগারে? নিশ্চয়ই মাইনের টাকায় নয়। দেখছেন না, চারপাশের সব কিছুর দাম বেড়ে গেছে অথচ লোকে প্রতিবাদ না করে দিব্যি ম্যানেজ করে যাচ্ছে। ও বেচারাকে একটাকা আট আনার জন্যে দোষ দিয়ে কি লাভ?'

কথাগুলো শোনামাত্র আমার গা-গুলানি ভাবটা উধাও হয়ে গেল। মনে হল ভদ্রলোকের প্রত্যেকটা কথাই সত্যি। বাড়তি রোজগার তো খেটেখুটে হয় না। আর বাড়তি রোজগার না করলে মানুষ ছেলেমেয়েদের নিয়ে বাঁচবে কি করে? এদেশে শ্রেণীহীন সমাজ ব্যবস্থা, অর্থনৈতিক সমবন্টন, ইত্যাদি ইত্যাদি ব্যাপারগুলো চালু করা আর সোনার পাথরবাটি কিনে আনা যে একই ব্যাপার তা গণতান্ত্রিক দলের নেতারা বুঝে গিয়েছেন বলেই তাঁরা আর ও পথে এগোচ্ছেন না। যে যা পারো লুটেপুটে খাও, বেঁচে থাকো কিন্তু খবরদার দলের শৃঙ্খলা ভেঙো না। ওটা ভাঙলেই তোমাকে দলবিরোধী কাজের জন্যে বহিষ্কার করা হবে।

কলেজ স্ট্রিটে নেমে বাবার কথা মনে এল। ওই লোকটির উপদেশ বাবার কাছে নিশ্চয়ই কথামৃত। শুনলে খুশি হতেন। আচ্ছা, এসব সত্য জানা সত্ত্বেও আমি মেনে নিতে পারি না কেন? কেন মনের ভেতর খচ্‌খচ্‌ করে? আহা, এই খচ্‌খচ্‌ শব্দটাও তো দারুণ।

প্রকাশনা সংস্থাটি বেশ বড়। এদেশে তো বটেই বাংলাদেশেও এদের বিশাল কারবার। আমি এখানে চাকরি করি না। চাকরি এঁরা আমাকে অফার করেননি। কিন্তু একটা টেবিল চেয়ার দিয়েছেন। প্রুফ এলে টেবিলে পাঠিয়ে দেন। দু' ঘণ্টা অন্তর চা খাওয়ান এবং দুপুরে রুটি এবং আলুরদমের ব্যবস্থা থাকে। এতেই আমার চলে যায়।

টেবিলে বসামাত্র বেয়ারা প্রুফ দিয়ে গেল। আমার একপাশে চলন্তিকা এবং

সংসদ। বাংলাভাষার প্রহরী। খুব জনপ্রিয় একজন ঔপন্যাসিকের উপন্যাস। বছরে চার পাঁচটা সংস্করণ চোখ বন্ধ করে বিক্রি হয়। অবশ্য এঁর জনপ্রিয়তা বাংলাদেশেই বেশি। তিনলাইন পড়তেই আমার গা গুলিয়ে উঠল। ভুল বানান যদি দীর্ঘ-উ কেউ লেখে তাহলে তার লেখা ভুলে যাওয়া উচিত। উপন্যাসের শুরু হয়েছে এইভাবে। 'তোমাকে ভীষণ ভালবাসি। দয়া করে তুমি আমাকে ভুল বুঝো না প্রিয়া।' উনিশশো ছিয়ানব্বইতে এই রকম লেখা যাঁরা লেখেন তারা কী তা আমি জানি, কিন্তু যাঁরা পড়েন, পয়সা দিয়ে বই কিনে পড়েন তাঁরা কোন গ্রহের মানুষ? এছাড়া নায়ক ধুতি পরে বাড়ি থেকে বের হল এবং একটু বাদেই রাস্তায় জল জমা থাকায় প্যান্টের পা গোটাল। নায়িকার নাম প্রিয়া, পিয়া, তিয়া এক এক পাতায় এক এক রকম। বাক্য মাঝে মাঝেই অসম্পূর্ণ! আমি টেবিল থেকে উঠলাম।

অফিস ঘরের ভেতর একটা কাঁচের ঘর। প্রকাশক মশাই সেখানে বসেন। রোগা ফর্সা প্রৌঢ় ভদ্রলোকটি শিক্ষিত এবং সুদর্শন। মাস কয়েক আগে ওঁর ঘরে ঢুকে বলেছিলাম, 'ভাল বাংলা বানান জানি, কাজ দেবেন?' তিনি আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বলেছিলেন, 'লেখার নেশা আছে নাকি?'

'না।'

'তাহলে বসো। কি নাম?'

কাজটা হয়ে গিয়েছিল। দরজায় টোকা দিয়ে ভেতরে ঢুকলাম। উনি কিছু হিসেব করছিলেন। বিরক্ত হয়ে তাকালেন। বললাম, 'কিছু যদি মনে না করেন তাহলে একটা কথা বলব।'

'বল।'

'আপনি বাংলা সাহিত্যের ক্ষতি করছেন।'

'আমি?' চমকে উঠলেন ভদ্রলোক, 'কি রকম?'

'স্বজন মুখোপাধ্যায়ের যে উপন্যাসটা ছাপা হচ্ছে সেটা আপনি পড়েছেন?'

'না।'

'সেকি? আপনি না পড়ে বই ছাপছেন?'

উনি সোজা হয়ে বসলেন। কলম বন্ধ করলেন, 'পড়া উচিত বলে মনে করিনি। স্বজনবাবুর বই-এর স্টেডি সেল আছে।'

'ও। তাহলে কিছু বলার নেই। আপনার তো আরও অনেক প্রুফ রিডার আছে তাদের কাউকে ওর প্রুফ দিলে আমার ভাল লাগবে।'

'কেন?'

'উনি লিখতে জানেন না। বাক্য অসংলগ্ন, অজস্র বানান ভুল। ভেতরে তথ্যের অসংলগ্নতা মাথা খারাপ করে দিচ্ছে।'

'নিয়ে এসো।'

বেরিয়ে এসে প্রুফ নিয়ে গেলাম। তিনি দেখলেন। তারপর বললেন, 'মানুষ করে দাও।'

'মানে?'

'রিরাইট করে দাও।'

'অসম্ভব।'

'বাজে কথা বোল না। এ বই ছাপা হলে যখন বাংলা সাহিত্যের ক্ষতি হবে তখন তোমার উচিত সেই ক্ষতিটা যাতে না হয় তা দেখা।'

'আপনি অদ্ভুত কথা বলছেন। রিরাইট হলে সমস্ত লেখাটাই নতুন করে লিখতে হবে। অথচ সেটা ওঁর নামে ছাপা হবে, টাকা উনিই পাবেন।'

'ও ব্যাপারে কথা বলছি।' টেলিফোন তুলে ডায়াল করলেন প্রকাশক, 'হ্যালো, স্বজনবাবু ভাল আছেন? হ্যাঁ, আগেরটা আবার এডিসন হয়েছে। কিন্তু স্বজনবাবু আমি যে মুশকিলে পড়েছি। কি করি বলুন তো? হ্যাঁ। একজন সাংবাদিক এসেছেন আপনার পাণ্ডুলিপি দেখতে। উনি ফটোকপি ছাপবেন কাগজে, মানে আপনার ওপর কভারেজ করবেন। হ্যাঁ, ভাল কথা, কিন্তু মুশকিলটা এখানেই। কেন? আপনার হয়তো সময় কম ছিল তাই প্রতি পাতায় অন্তত কুড়িটা বানান ভুল, সেন্টেন্সে গোলমাল। এগুলোর ছবি ছাপা হলে কি হবে ভেবেছেন? আমি বলি কি আপনি যদি নতুন করে—! হ্যাঁ, সময় কম, তা আমি জানি। আচ্ছা, এককাজ করলে হয়। আমার পরিচিত একটি ছেলেকে দিয়ে কাজটা করিয়ে নিই? হ্যাঁ, খুব ভাল বানান জানে। না না কেউ জানবে না। তবে বিনা পয়সায় তো করবে না। ধরুন — আপনার প্রাপ্য থেকে তিন-চার পার্শেন্ট ওকে দিয়ে দিলে সম্মানটাও থাকে আপনার নামও বেড়ে যাবে। না দু-চারশো দিলে ও রাজি হবে না, তাছাড়া খবরটা তো চেপে রাখার ব্যাপার আছে, এটা বুঝছেন না কেন? ঠিক আছে তো? ও কে!'

রিসিভার নামিয়ে রেখে বললেন, 'যাও।'

'উনি রাজি হলেন?'

'হয়েছেন। তুমি প্রুফেই কারকেশন করতে করতে যাও।'

'আমি অন্যের হয়ে লিখব?'

'আপত্তি কেন? তুমি সন্তোষকুমার ঘোষের নাম শুনেছ?'

'হ্যাঁ। শ্রীচরণেষু মাকে-র লেখক।'

'উনি একজন বিখ্যাত সাংবাদিকের নামে রবীন্দ্রনাথের জীবনী লিখেছিলেন। সেই বইতে কোথাও ওঁর নাম ছাপা ছিল না। তুমি ভেবে নাও, বাংলা সাহিত্যকে বাঁচিয়ে দিচ্ছ। আরে, আমি না ছাপি আর একজন কৃতার্থ হয়ে ওই বই ছাপবে। বুঝেছ?'

টেবিলে ফিরে এসে নিজের সঙ্গে লড়াই করতে আরম্ভ করলাম। কি করব বুঝতে পারছি না। একটা মন বলছিল, এ অন্যায়, খুব অন্যায়। আর এক মন বলছিল, এটা শ্রাদ্ধের মত কাজ। করা উচিত। এই বই ছাপা হলে অন্তত ষাট টাকা দাম হবে। যারা খেয়ে না খেয়ে বই কেনে তাদের উপকার করা হবে।

প্রথমে পুরো উপন্যাসটি পড়ে ফেললাম। সেই ত্রিকোণ প্রেমের গল্প। কোন সময়ের গল্প, নায়ক নায়িকা কি করে এসব নিয়ে লেখক মাথা ঘামায়নি। কিন্তু একটা জিনিস লক্ষ্য করলাম। এই লেখক গপ্পো বলতে জানেন। যত খারাপ লাগুক আমাকে শেষ পর্যন্ত পড়িয়ে তো ছাড়ল। প্রচণ্ড গতি। বাবার আলমারিতে একটা উটকো বই পেয়েছিলাম। ওই রাজনৈতিক মতবাদ বোঝাই বইগুলোর পেছনে সেটা পড়েছিল। মোহন সিরিজের বই। মোহন সিরিজের নাম আমি কলেজে পড়তে শুনেছি। বাংলা ডিটেকটিভ উপন্যাসের ইতিহাস বলতে হলে ওই মোহন সিরিজের কথা সমালোচকরা একটু আধটু বলে থাকেন। তা আগ্রহী হয়ে বইটি পড়লাম। ওই সিরিজ নাকি একসময় খুব জনপ্রিয় ছিল। ওই লেখকের লেখায় গতি ছিল। যখনই কোন সমস্যার সামনে নায়ক দিশেহারা তখন লেখক সমাধান করতেন এই বলে, কোথা হইতে কি করিয়া কি হইয়া গেল মোহন জানে না কিন্তু—। বাঙালি পাঠককুল পড়ার সময় এই গোঁজামিল মেনে নিয়েছিলেন। ঠিক একইভাবে স্বজনবাবু বাজারে করে খাচ্ছেন।

একবার মনে হল অত ঝামেলার দরকার কি? আমার কাজ প্রুফ দেখা। বানান ঠিক করে দেওয়া প্যারাগ্রাফ সাজিয়ে দেওয়া আর কোন বাক্যে গোলমাল থাকলে সেটা ঠিক করা। তাই করি। আমি শুরু করলাম। দুপুরে আলুরদম দিয়ে রুটি সবে শেষ করেছি এমন সময় স্বজনবাবু হন্তদন্ত হয়ে ঘরে ঢুকলেন। কোনদিকে না তাকিয়ে সোজা প্রকাশকের কাচের ঘরে চলে গেলেন তিনি। ভদ্রলোকের পরনে শু, ধুতি আর সিল্কের পাঞ্জাবি। এই রকম পোশাকে লেখক আজকাল বড় একটা

দেখা যায় না।

আমি আবার কাজ শুরু করতেই উনি বেরিয়ে এসে আমাদের ম্যানেজারকে কিছু জিজ্ঞাসা করলেন। ম্যানেজার আমাকে দেখিয়ে দিতে একটা চেয়ার টেনে আমার পাশে বসলেন, 'কি নাম ভাই?'

নিজের নাম বলতে খারাপ লাগল। বললাম, 'বলুন।'

'ইয়ে, হয়েছে কি, এই লেখাটা খুব তাড়াহুড়োর মধ্যে লিখেছি। যদি ভুল ভাল কিছু হয়ে তাকে তাহলে ঠিকঠাক করে দেবেন ভাই,' স্বজনবাবু বললেন।

'আপনি রবীন্দ্রনাথের কবিতা ভুল কোট করেছেন।'

'অ! ওটা অবশ্য অনেকেই করে। মানে, দেখবেন, কিছু লোক করার সময় রবীন্দ্রনাথের কবিতা বলল কিন্তু সব শব্দ ঠিক বলল না। আমি ওই বাস্তবচিত্রটা ধরতে চেয়েছি। ঠিকঠাক করে দিন। কিন্তু ভাই কথাটা পাঁচ কান করবেন না।'

লোকটার গলার স্বর এমন যে আমার মজা করতে ইচ্ছে করল। প্রকাশকের ঘর দেখিয়ে·বললাম, 'কিন্তু উনি আমাকে বলেছেন পুরো উপন্যাসটাকে রিরাইট করতে।'

'বলেছেন?'

'হ্যাঁ।'

'বেশ করুন। গল্পটা ঠিক রাখবেন। আর স্পিড। স্পিডটা নষ্ট করবেন না। আমার এ্যাসেট হল ওটা। ওটা যেন নষ্ট না হয়।'

'দেখছি।'

'আপনি গপ্পো লেখেন?'

'না।'

'বাঁচা গেল। যারা গপ্পো লেখে তারা তাদের মত লিখবে। তাদের নিজেদের লেখা যখন পাবলিক পড়ে না তখন আমার হয়ে লিখলে তার হালও ওই একই রকম হবে। তা আপনি যখন লেখালেখি করেন না তখন ভরসা পাওয়া গেল। আজ সন্ধেবেলায় কি করছেন?'

'কেন?'

'আসুন না। একটু খাওয়াদাওয়া যাবে।'

'কোথায় যেতে হবে?'

একটা কাগজ টেনে ফসফস করে ঠিকানা লিখলেন স্বজনবাবু। সেটা আমার সামনে এগিয়ে দিয়ে বললেন, 'চলে আসুন। ওখানে গল্প পাবো। আপনি আমাকে

সাহায্য করলে আর দেখতে হবে না।' একটা চোখ কুঁচকে উঠে গেলেন ভদ্রলোক।

আমার মাথায় কিছু ঢুকছিল না। সাহিত্য কি সহকারিকে সঙ্গে নিয়ে করা যায়? বঙ্কিম বা রবীন্দ্রনাথ অথবা শরৎচন্দ্র মাথায় থাকুন, বিভূতিভূষণ তারাশংকর এমন প্রস্তাব শুনলে কি আত্মহত্যা করতেন না? নাকি যুগ পাল্টেছে, এ্যাপ্রোচও। এখন কম্প্যুটারের যুগ। পাঠক যা চান তাই লেখক উগরে যদি না দেন তাহলে বাজার শেষ হয়ে যাবে। এমন কত লেখক তো লেখেন। বিভিন্ন পত্রপত্রিকা দূরে থাক, দেশ পত্রিকার প্রতি সংখ্যায় কত নতুন লেখকের গল্প, সদ্য পরিচিত লেখকের ধারাবাহিক উপন্যাস। অথচ সেগুলো সম্পর্কে পাঠক মোটেই উৎসাহী নয়। অথচ স্বজনবাবুদের উপন্যাস বাজারে বেরুলেই এডিসন হয়ে যায়। বইমেলায় লোকে অটোগ্রাফ নেবে বলে কেনে। এইসব লোক তো বুদ্ধু নয়। স্বজনবাবুর উপন্যাস না কিনে ছয়শো গ্রাম মাংস কিনলে রবিবারের দুপুরে ভাতের স্বাদ আরও চমৎকার হত। কিন্তু তাতো করছে না। আমার কাছে ধন্দ. এখানেই।

কয়েকদিন আগে একটি ছেলে ভুল করে অফিসে ঢুকে পড়েছিল। আমার সামনে এসে জিজ্ঞাসা করেছিল, 'আচ্ছা স্বজন মুখোপাধ্যায়ের 'দুপুর ঠাকুরপো' বইটা আছে? আমি কিনতে চাই।' অবাক হয়ে তাকালাম। বড়জোর কুড়ি বছর বয়স। দুপুর ঠাকুরপো, যে কোন উপন্যাসের নাম হয় তা আমি ভাবতে পারি না।

ম্যানেজার শুনছিলেন, বললেন. 'আমাদের সেলস কাউন্টারে যান ভাই।'

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'কত দাম?'

'আশি টাকা।' ম্যানেজার বলার আগেই ছেলেটি জানাল।

'আপনি বুঝি খুব উপন্যাস পড়েন?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'শ্রীমতী কাফে পড়েছ?'

'স্বজন মুখার্জীর লেখা?'

'না। সমরেশ বসুর উপন্যাস।'

'নাঃ। ওসব পুরনো লেখা পড়া হয়নি। আচ্ছা চলি।'

কথাটা মনে পড়তেই আমার খুব রাগ হল। যে লোকটা সমরেশ বসুর পায়ের যোগ্য নয় তার বই আমাকে রিরাইট করতে হবে কেন? শুধু টাকার জন্যে? কোন দরকার নেই। ঠিক করলাম, প্রুফ দেখে দায় শেষ করব। রিরাইট করা আমার

দ্বারা হবে না। প্রকাশক যাই মনে করুন, আমি নাচার।

পাঁচটা নাগাদ আমি বের হলাম। অফিসের সামনে দাঁড়িয়ে ভাবছি এখন কোথায় যাওয়া যায়? কফি হাউসে অবশ্য যাওয়া যেতে পারে। কিন্তু কি লাভ? সেই টেবিলে বসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা পরনিন্দা পরচর্চা করা কাঁহাতক ভাল লাগে। কফি হাউস এক আজব জায়গা। যদি কেউ বলে গত দশ কি কুড়ি বছর ধরে নিয়মিত কফি হাউসে আসছে তাহলে চোখ বন্ধ করে বলে দেওয়া যায় লোকটির জীবন চোরাবালিতে আটকে গিয়েছে। সাফল্য পেলে কেউ আর অনর্থক সময় নষ্ট করার জন্যে কফি হাউসে আসে না।

'তুমি এখানে দাঁড়িয়ে আছ?'

পেছন ফিরে তাকালাম। প্রকাশক বেরিয়ে এসেছেন।

'ভাবছি কোথায় যাওয়া যায়!'

'যাওয়ার কোন জায়গা নেই বুঝি?'

'তা না—!'

'আমার সঙ্গে চলো।'

'কোথায়?'

'রবীন্দ্রসদনে। রবীন্দ্রনাথের গানের প্রোগ্রাম আছে।'

'রবীন্দ্রনাথের গান?'

'ওহো, জানো না। আমরা যাকে রবীন্দ্রসঙ্গীত বলতাম এখনকার ছেলেমেয়েরা তাকেই রবীন্দ্রনাথের গান বলে। চলো।'

ভদ্রলোক হঠাৎ আমার ওপর এমন সদয় হচ্ছেন কেন বুঝতে পারছি না। এই কয় মাসে তিনি প্রয়োজন ছাড়া একটাও কথা বলেননি। মাঝে মাঝে মনে হত উনি আমাকে চেনেনই না।

রবীন্দ্রসদনের পেছনে গাড়ি পার্ক করতেই কানে এল কেউ গান গাইছে। সুন্দর, উদাত্ত গলা মাইকে ভেসে আসছে না। উদাসী হাওয়ায় পথে পথে—। গাড়ি থেকে নামতেই লোকটিকে দেখতে পেলাম। মুখে দাড়ি, হাতে ব্যাগ। গান গাইতে গাইতে হনহন করে হাঁটছে। একবার গেটের কাছে চলে যাচ্ছে, আর একবার পার্কিং লটের কাছে ফিরে আসছে। কোনদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই। গানটা শেষ হতেই আর একটা ধরল। প্রকাশক বললেন, 'বাঃ, গাইছে বেশ ভাল কিন্তু পাগল নাকি?'

সদনের সদর দরজার দিকে এগিয়ে গেলাম। কিন্তু লোকটি আমাকে আচ্ছন্ন

করল। যে ভঙ্গিতে ও গাইছে তা একমাত্র নিজের জন্যেই গাওয়া যায়। পৃথিবীর অন্য কেউ সেটা শুনছে কিনা তা নিয়ে ওর বিন্দুমাত্র মাথা ব্যথা নেই। এই মুহূর্তে ও নিজেই নিজের রাজা। এমন সুখ ক'জন মানুষ পেতে পারে। নিজের কাছে ছাড়া আর কারও কাছে ওর কোন দায় নেই।

রবীন্দ্রসদনের চাতালে মোটামুটি ভিড়। মেয়েরা সব সেজেগুজে এসেছে। আমি লক্ষ্য করেছি, রবীন্দ্রনাথ হলেই কলকাতার কিছু মহিলা অফ হোয়াইট শাড়ি পরেন, চুলে সাদা ফুল। তখন তাঁদের তাকানো হাঁটাচলা সম্পূর্ণ বদলে যায়। ঠিক আশ্রমবালিকা যাকে বলে তা নয় কিন্তু নিজেকে শুদ্ধ দেখাবার চেষ্টা প্রকট থাকে। প্রকাশকের আসন প্রথম সারিতে। তার পাশে আমাকে বসালেন। কানের কাছে মুখ নিয়ে বললেন, 'বুঝলে হে, আমি রবীন্দ্রসঙ্গীত শুনে আসছি সায়গলের আমল থেকে। হ্যাঁ।'

সায়গল? যদ্দুর জানি পঞ্চাশ সালের অনেক আগেই ভদ্রলোক গত হয়েছেন। আমার এই প্রকাশকের বয়স কিছুতেই পঞ্চান্নর বেশি নয়। পঞ্চাশ সালে ওঁর বয়স ছিল বড় জোর উনিশ। ওই বয়সে কেউ—। তাই বা বলি কেন? শুনেছি উনি ওপার বাংলার লোক। কুড়ি বছর বয়সে ভাগ্যান্বেষণে কলকাতায় এসেছিলেন। তাহলে সায়গলের গান শুনলেন কখন? আমি চাপা গলায় বললাম, 'আপনি গুল মারছেন!'

'কি? কি বললে?'

'আপনি শুনতে পেয়েছেন। গুল যারা মারে তাদের কান খুব শার্প হয়।'

'অ। আমি গুল মারছি?'

'এই তো শুনেছেন!'

'তুমি তোমার বস্-এর সঙ্গে ওই ভাবে কথা বলবে?'

'দেখুন, আমি যদি বলতাম আপনি মিথ্যে কথা বলছেন তাহলে আপনি খুব রাগ করতেন। কিন্তু গুল মারছেন বললে আপনার একটু কাটলো কিন্তু রক্ত পড়ল না।'

'বাঃ। তুমি দেখছি বেশ বুদ্ধিমান। গুড।'

'আমার বাবা এটা মনে করেন না, আপনি করলেন।'

'উনি তাহলে তোমার সঙ্গে মেশেননি। যাকগে, স্বজনের উপন্যাসটায় হাত দিয়েছ।'

'হাত! ওটা ঠিক করতে গেলে দশটা হাত লাগবে। মা দুর্গাকে ডেকে আনুন।'

'ওসব বললে তো চলবে না। পাবলিক যা খায় তাই লিখছে স্বজন।'

'আমি বানান আর সেনটেন্স দেখে দিচ্ছি।'

'কি? রিরাইট করছ না?' প্রকাশক হতভম্ব।

'না। বিবেকে লাগছে।'

'এই কথা বলার জন্যে আমি তোমাকে স্যাক করতে পারি, তা জানো?'

'করে দিন। আমি তাহলে বেঁচে যাই।'

'এ্যাঁ। তার মানে?'

'একটা কুৎসিত পরিশ্রম করতে হয় না তাহলে।'

প্রেক্ষাগৃহ তখন প্রায় ভরে গেছে। অনুষ্ঠান আরম্ভ হতে মিনিট দশেক দেরি আছে। আমি ভাবছিলাম, এখনই আমাকে ওখান থেকে উঠে যেতে হবে। কিন্তু প্রকাশক মুখ খোলার আগেই একজন সুন্দরী মহিলা এগিয়ে এলেন। অফ হোয়াইট সিল্কের শাড়ি, মিলিয়ে ব্লাউজ, কপালে চন্দনের টিপ। মহিলা প্রকাশককে বললেন, 'ও মা, কখন এসেছ! আমি ভাবতে পারছি। কি ভাল লাগছে!'

প্রকাশক জোর করেই বোধহয় হাসলেন, 'তোরা কেমন আছিস?'

'আমি ভাল। শুধু মায়ের বাতের ব্যথা আবার বেড়েছে। শোন মামা, আমি তোমার অফিসে যাব। আমার কয়েকটা রেফারেন্স বই-এর দরকার আছে। তোমাকে হেল্প করতে হবে।'

'এম. এ. করেছিস অনেকদিন! এখন ওসব বই-এর কি দরকার।'

'ওটা তুমি বুঝবে না।'

হঠাৎ মহিলা আমার দিকে তাকালেন, 'কিছু মনে করবেন না, আপনাকে খুব চেনা চেনা মনে হচ্ছে। আপনি কি কলকাতা ইউনিভার্সিটিতে পড়তেন?'

'হ্যাঁ।'

'কি সাবজেক্ট ছিল?'

'বাংলা।'

'এই, তুমি বিপ্লব। না?'

'হ্যাঁ।'

'আমায় চিনতে পারছ না? আমি সুভদ্রা।'

সুভদ্রা? আমি মনে করার চেষ্টা করলাম। কিন্তু মন বিশ্বাসঘাতকতা করল। সুভদ্রা নামের কোন মেয়ের কথা মনে পড়ল না।

'কি, মনে পড়ছে না?'

'না। আমি কিছু মনে করতে পারছি না।'

'আমরা তিনবন্ধু সবসময় একসঙ্গে ঘুরতাম, একই শাড়ি পড়ে ক্লাশে যেতাম। তাই ছেলেরা আমাদের নাম দিয়েছিল ত্রিধারা। মনে পড়ছে?'

এবার আবছা মনে এল। তিন বন্ধু, খুব হাসত। অন্য মেয়েরা ছেলেদের সঙ্গে আড্ডা মারলে ওই তিনজন কখনই ছেলেদের সঙ্গে কথা বলত না। কিন্তু তিনজনকে একসঙ্গে মনে পড়ছে, আলাদা করে একে নয়। আমি মাথা নাড়লাম, 'হ্যাঁ, বাকি দু'জনের সঙ্গে যোগাযোগ আছে তো?'

'চিঠিতে। মঞ্জুলা এখন আমেরিকায়। ওর স্বামী ওখানে ডাক্তারি করে। রত্না দিল্লিতে। দু'জনেরই বিয়ে হয়ে গিয়েছে। কি করছ তুমি?' সুভদ্রা জিজ্ঞাসা করল।

'আপাতত তোমার মামার পাবলিকেশনে গিয়ে প্রুফ দেখি।'

'সেকি? অন্য কিছু—!'

প্রকাশক এবার কথা বললেন, 'তোরা এবার মুখ বন্ধ করবি? এখনই পর্দা উঠবে। এই, তুই তোর সিটে চলে যা। ইনটারভ্যালে আসিস।'

সুভদ্রা গম্ভীর মুখে চলে গেল। আমার অত সামান্য কাজ করা বোধহয় ওকে খুব বিভ্রান্ত করেছে। হ্যাঁ, এম. এ. পাশ করে একজন মাত্র আটশো টাকার বিনিময়ে বানান ঠিক করে দেয়, অন্য কোন এ্যাম্বিশন নেই, এটা কারও ভাল লাগার কথা নয়।

পর্দা ওঠার আগে প্রকাশক বললেন, 'তুমি এম এ পাশ করে পড়ানোর দিকে গেলে না কেন?'

'আমার জন্যে চাকরি নিয়ে কেউ বসে নেই, তাই।'

'তুমি বড্ড বাঁকা বাঁকা কথা বল তো হে!'

'আপনার কান এসব শুনতে অভ্যস্ত নয়, তাই ব্যাঁকা বলে মনে হচ্ছে।'

পর্দা উঠল। ঘোষক খুব ইনিয়ে বিনিয়ে সাধ এবং সাধ্যের গল্প শোনালেন। একেবারে প্রথম একজন মধ্যবয়সী মহিলা এলেন উদ্বোধনী সঙ্গীত গাইতে। আগুনের পরশমণি ছোঁয়াও প্রাণে—! ইনিয়ে বিনিয়ে দুলে দুলে গান লোকে চুপচাপ শুনেছিল। তারপর রবীন্দ্রসঙ্গীত সহযোগে নৃত্য। রবীন্দ্রনাথের গানের সঙ্গে নাচ, একথা ঘোষক বললেন না। আমার হৃদয় তোমার আপন হাতে দোলে, মঞ্চের ওপাশ থেকে গান ভেসে এল আর বছর তিরিশের এক মহিলা চকচকে শাড়ি পেঁচিয়ে পরে ছুটে এলেন মঞ্চে। গানের কথার রূপ দিলেন হাত পা চোখের ভঙ্গিমায়। দোলাও দোলাও-এর সঙ্গে যেভাবে হাত নাড়লেন তা শিশুকে

ঘুম পাড়াবার সময় মায়েরা ওইভাবে হাতে তুলে দোলায়। কিছুক্ষণ দেখার পর অসহ্য মনে হল আমার কাছে। এইসব বুড়োধাড়ি মেয়েকে ধমকে থামিয়ে দিয়ে বলা উচিত, 'তোমার বয়স কত মা? পাঁচ বছরের বাচ্চা যা করে তা মেনে নেওয়া যায়, কিন্তু তোমাকে কি মানায়?'

আমি উঠে দাঁড়ালাম। প্রকাশক চাপা গলায় জিজ্ঞাসা করলেন, 'একি? কোথায় যাচ্ছ?'

'এসব দেখলে আমার শরীর খারাপ হয়ে যাবে।' ওঁকে কোন কথা বলার সুযোগ না দিয়ে হনহন করে বেরিয়ে এলাম। হলের বাইরে এসে মনে হল, আহা, কী আরাম।

আচ্ছা, রবীন্দ্রনাথ যদি বাংলায় না জন্মাতেন, বাংলাভাষায় না লিখতেন তাহলে বাঙালি কি নিয়ে থাকতো। এইসব ধ্যাস্টামো কিভাবে করত? নজরুল যা লিখেছেন তা নিয়ে এইসব ইয়ার্কি করা যায় না। মধুসূদন বড্ড সিরিয়াস এবং এই লাইনে তাঁকে ফেলা যায় না। রবীন্দ্রনাথ বাঙালিকে আমোদিত হতে সাহায্য করলেন। মাঝে মাঝে মনে হয়, উনি তো বাঙালিকে অনেক দিয়েছেন, একটা আধশোওয়া জাতিকে টেনে তুলে ছুটতে সাহায্য করেছেন, কিন্তু কী দরকার ছিল ওঁর নৃত্যনাট্য লেখার? রোগা রোগা বাবড়ি চুল রাখা ধেড়ে ধেড়ে ছেলেগুলো ওইসব নৃত্যনাট্যে শরীর দোলায়, পৌষ তোদের ডাক দিয়েছে-র সময় আঙ্গুলের মুদ্রায় কাকে তারা ডাকে তারা নিজেরাই জানে না। যে আবেগ কবির কলমে ছিল তা এইসব নাচিয়েদের কল্যাণে উধাও।

বাসস্টপে দাঁড়ালাম। রবীন্দ্রসদনের সামনে বাসস্টপটায় এই সময়েও বেশ ভিড়। হঠাৎ নজরে এল একটি অল্পবয়সী মেয়ে বিরক্ত হয়ে সরে আসছে আমার দিকে। তার ঠিক পাশেই মধ্যবয়স্ক একটি লোক যার হাতে গাড়ির চাবি। লোকটা চাবিটা দেখানোর ভঙ্গি করে নাড়ছে। মাথাটা গরম হয়ে গেল। সোজা মেয়েটির পাশে গিয়ে বললাম, 'দাঁড়ান ভাই।' এবার লোকটাকে ডাকলাম, 'এই যে, এদিকে আসুন।'

লোকটা একটু হকচকিয়ে গেল। দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগল আমার মতলব কি!

বললাম, 'আপনার গাড়িটা কোথায়? এখানে নিয়ে আসুন। আপনার বাড়িতে আমরা যাব।'

মেয়েটি আঁতকে উঠল, 'আমি কেন যাব? আমি কোথাও যাব না।'

বললাম, 'আপনি ভয় পাবেন না। ওর গাড়িতে চড়ে আমরা ওর বাড়িতে গিয়ে

আত্মীয়স্বজনদের বলে আসব উনি বাসস্টপে মেয়ে দেখলেই গাড়ির চাবি দেখান। যান, নিয়ে আসুন গাড়ি।'

হঠাৎ লোকটা উদাসী হয়ে গেল। যেন পৃথিবীতে কোন সমস্যা নেই এমন ভঙ্গি করে হেঁটে যেতে লাগল আকাদেমির দিকে। একবারও ফিরে তাকাল না।

বললাম, 'এবার যান। আর ও আপনাকে বিরক্ত করবে না।' মেয়েটি সেই যাওয়া দেখে বলল, 'আমার খুব ভয় করছে।'

'কেন? কি বলেছে ও আপনাকে?'

'কিছু বলেনি। শুধু গাড়ির চাবি দেখিয়ে বলছিল, সঙ্গে গাড়ি আছে।'

'ঠিক আছে। বাসে উঠুন।'

তখনই একটা প্রাইভেট বাস এসে দাঁড়াল। মেয়েটি ভীতচোখে বলল, 'এই বাস।'

'বেশ। উঠুন। আমি না হয় একটু এগিয়ে দিচ্ছি।'

মেয়েটি ভিড়ের সঙ্গে মিশে গেল। আমি পাদানিতে। এইভাবেই যাওয়া আসা করতে হবে তা কলকাতার মানুষ মেনে নিয়েছে অনেককাল। গোটা পাঁচেক স্টপ চলে যাওয়ার পর মনে হল এখন তো মেয়েটার কোন ভয় নেই। ভাড়া দিয়ে টিকিট নিয়ে নেমে পড়লাম।

নামবার পর দেখলাম আমি এখন ভবানীপুরে। আমাকে ফিরতে হবে উল্টোদিকে। সময় নিয়ে ভাবি না, কিছু বাড়তি পয়সা খরচ হল। কয়েক পা হাঁটতেই আমার পা স্থির হল। উল্টো দিকের গলিতে ঢুকে তিন নম্বর বাড়িটা আমাকে টানতে লাগল। এটা কি রকম হল? এখানে আসার কোন কথা ছিল না। একেই কি কাকতালীয় ব্যাপার বলে। বছর খানেক আগে শেষবার আমি ওই বাড়িতে গিয়েছি। সেদিন হেনা বলেছিল, 'বিপ্লব, তুমি আর এখানে এসো না। আমি তোমাকে টলারেট করতে পারছি না। তোমার সঙ্গ আর পেলে আমি পাগল হয়ে যাব।'

সেই শেষ। এই একবছর কোন যোগাযোগ নেই, না দেখা, না ফোন।

আজ টানটাকে এড়াতে পারলাম না। গলিতে ঢুকলাম। তিন নম্বর বাড়িটা পাঁচতলা। লিফট আছে। হেনা থাকে তিনতলায়। লিফট থেকে নেমে বন্ধ দরজার সামনে দাঁড়িয়ে পকেট থেকে রুমাল বের করে মুখ মুছলাম। এক বছরে মানুষ কি একই রকম থাকে? হেনা কি একটুও পাল্টায়নি। তারপরেই মনে হল, আমিই কি পাল্টেছি?

উত্তরটা স্পষ্ট। না, পাল্টাইনি, একবছর আগে যা ভাবতাম তা বাতিল করার কোন কারণ ঘটেনি যখন তখন পাল্টাবো কেন? আমি যদি না পাল্টাই তাহলে হেনারও তো একই অবস্থা হওয়া স্বাভাবিক। অতএব আমার উচিত নয় ওকে বিরক্ত করা। আমি ফিরলাম। লিফটের বোতাম টিপলাম নেমে যাওয়ার জন্যে। একটু পরেই লিফট উঠে আসার আওয়াজ হল। লিফট উঠে আসছে। হেনা বা তার মা দেখতে পাওয়ার আগেই আমি নীচে নেমে যেতে চাই।

লিফট থামল। দরজা খুলে বেরিয়ে এল হেনা এবং তার পেছনে এক ছিমছাম যুবক। আমি চমকে গিয়েছিলাম। মুখ ফিরিয়ে নিতেই শুনলাম প্রচণ্ড উচ্ছ্বাস নিয়ে হেনা বলছে, ; 'আরে তুমি? কখন এলে? চলে যাচ্ছ যে। এসো এসো।' প্রায় দৌড়ে এসে হেনা আমার হাত ধরল। এক সেকেণ্ডের জন্যে হলেও আমি আরও ঘাবড়ে গেলাম। এই গলায় হেনা কখনও আমার সঙ্গে কথা বলেনি। আর এখন, শেষ কথা হয়ে যাওয়ার পর, এভাবে বলছে ভাবা যায় না।

আমি বললাম, 'না, থাক, মনে হচ্ছে তুমি এখন ব্যস্ত থাকবে!'

'ব্যস্ত? তুমি কি বলছ? এসো, কাম অরিত্র।' হেনা এগিয়ে গিয়ে বেল টিপল। তারপরে ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল, 'অরিত্র, মিট মাই ফ্রেণ্ড, বিপ্লব, আমার অনেক দিনের বন্ধু।'

অরিত্র মাথা নাড়ল, 'নমস্কার।'

লোকটা নমস্কার বলল, কিন্তু হাত তুলল না। এখন মনে হল, তুলতে যে হবেই তার কোন মানে নেই। মুখে বললেই তো মানে বোঝানো হল। দরজা খুলল যে কাজের মেয়েটি তাকে আমি চিনি না। অন্তত গত এক বছরে প্রথম পরিবর্তন নজরে এল। প্রথম বলা ঠিক হল না, দ্বিতীয়, প্রথম পরিবর্তন তো হেনার বলা একটু আগের কথাগুলো। যে ভঙ্গিতে ও কখনও কথা বলেনি তা আজ বলল।

'তোমরা একটু বসো প্লিজ।' হেনা সোফা দেখিয়ে ভেতরে চলে গেল।

আমরা বসলাম। বসা মাত্র অরিত্রকে দেখলাম একটা ম্যাগাজিন তুলে নিয়ে পাতা খুলতে। অর্থাৎ ও এখন আমার সঙ্গে কথা বলতে চায় না। আচ্ছা, এই লোকটা কে? হেনার সঙ্গে ওর কি ধরনের সম্পর্ক! যে ভঙ্গি নিয়ে ঘরে ঢুকল তাতে খুব অন্তরঙ্গ বলে মনে হচ্ছে না। এ কি অন্তরঙ্গ হবার চেষ্টা করছে? হঠাৎ বুকের ভেতর অস্বস্তি এল। সেটা মুহূর্তের জন্যে। তারপরেই ভাবলাম, এ নিয়ে আমি ভাবছি কেন? হেনা এখন স্বাধীন। কারও কাছে কোন অবলিগেশন নেই।

যা ইচ্ছে তাই ও করতে পারে।

হেনা ফিরে এল, 'কি খাবে বল? চা, কফি না ঠাণ্ডা?'

অরিত্র কাঁধ নাচাল। আমি বললাম, 'কিছু না।'

'এখনও রাগ পড়েনি?'

'মানে?'

'তুমি না একটা যাচ্ছেতাই।' হাসল হেনা, 'জানো অরিত্র, বিপ্লব বড় অভিমানী। ক'দিন আগে ওর সঙ্গে একটা অ্যাপেয়েন্টমেন্ট ফেল করেছি, বাবুর রাগ হয়ে গেল।'

অরিত্র ম্যাগাজিন রেখে আমায় দেখল তারপর হেনাকে।

হেনা হাসল, 'আমরা খুব পুরনো বন্ধু। আমরা পরস্পরকে খুব ভাল বুঝতে পারি।'

'ও।'

'বিপ্লব, অরিত্র খুব আপ রাইজিং। আমার সঙ্গে সম্প্রতি আলাপ হয়েছে। আমার এক অফিস কলিগ ওর বন্ধু, সেই সুবাদে।'

হঠাৎ অরিত্র ঘড়ি দেখল, 'মাই গড।' সে উঠে দাঁড়াল।

হেনা জিজ্ঞাসা করল, 'কি হল?'

'একদম ভুলে গিয়েছিলাম। আমার জন্যে ক্যালকাটা ক্লাবে একজন অপেক্ষা করছে। আমি খুবই দুঃখিত, আমাকে এখনই চলে যেতে হচ্ছে।' সে আমার দিকে তাকিয়ে হাসল।

হেনা বলল, 'কিন্তু —!'

অরিত্র কাঁধ নাচিয়ে দরজার দিকে এগোলো। হেনা চটপট ওর পেছনে ছুটল। অরিত্রকে দরজা খুলে দিয়ে সে বলল, 'আমার খুব খারাপ লাগছে। কিন্তু কাজ থাকলে তো কিছু করার নেই!'

অরিত্র মাথা নেড়ে বেরিয়ে যেতেই সে দরজাটা বন্ধ করল।

ফিরে যখন এল তখন আমি অন্য হেনাকে দেখলাম, মুখের একটা উপশিরাও নড়ছে না। স্থির পায়ে আমার উল্টোদিকের সোফার পাশে এসে জিজ্ঞাসা করল, 'কি ব্যাপার?'

'আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। তোমার সঙ্গে একবছর দেখা হয়নি অথচ তুমি ভদ্রলোককে বললে ক'দিন আগে আমার সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট ফেল করেছ। কি ব্যাপার?'

'ওটা না বললে অরিত্র এখান থেকে এখন চলে যেতো না। ও যখন আজ আমার কাঁধে চেপেছিল তখন ভেবে পাচ্ছিলাম না কি করে ওকে কাটাবো। আজকের সন্ধেটা ওর প্রেম প্রস্তাব শুনে নষ্ট করতে হবে বলে খারাপ লাগছিল। তা হঠাৎ তোমাকে দেখে মনে হল বেঁচে গেলাম। আমার কথা শুনে তুমি প্রতিবাদ করোনি সেটা ইনডাইরেক্টলি আমাকে হেল্প করেছে, তাই তোমাকে ধন্যবাদ। কিন্তু তুমি কি বিশেষ কোন কারণে এখানে এসেছিলে?' হেনা তখনও বসছিল না।

'না।'

'তাহ'লে?'

'হঠাৎ এ পাড়ায় চলে আসি। আসার পর মনে হল অনেকদিন দেখা হয়নি।'

'হঠাৎ এ পাড়ায় চলে আসি মানে? প্ল্যান না করে কেউ আসে নাকি? এরকম সিলি যুক্তি দেবার বয়স তুমি দশ বছর আগে পেরিয়ে এসেছ বিপ্লব। তাছাড়া অনেককাল দেখা হয়নি মানে এই নয় দেখা করার জন্যে ছটফট করতে হবে। তোমার সঙ্গে আমার শেষবার যে কথা হয়েছিল তা নিশ্চয়ই মনে আছে। যাকগে, আজকে তুমি আমাকে ইনডাইরেক্টলি সাহায্য করেছ। চা খাবে?'

'না।'

'তাহলে—!'

আমি হেনার দিকে তাকালাম, 'তুমি আমাকে চলে যেতে বলছ?'

'আমি খুব টায়ার্ড!'

'টায়ার্ড। একটু আগে অরিত্র যখন এসেছিল তখন তোমাকে দেখে বা কথা শুনে একটুও মনে হয়নি ওকথা। আমি না থাকলে নিশ্চয়ই অরিত্র এখনই উঠে যেত না!'

হঠাৎ হেনা শরীরটাকে দ্রুত সোফায় নিয়ে গেল, 'কি করতে চাও তুমি? বসতে চাও? বসো কতক্ষণ বসবে দয়া করে বলে দাও সেইমত তৈরি হই।'

'হেনা?' আমি চমকে উঠলাম।

হেনা মুখ ফেরাল অন্য পাশে।

'বেশ। আমি যাচ্ছি।'

'এক মিনিট! বসো। আমি খুব অবাক হয়ে গেছি তোমার ব্যাপার দেখে।'

'মানে?'

'যে তুমি আমার সঙ্গে কোনরকম এ্যাডজাস্ট করতে চাইতে না সেই তুমি

আজ এলে কেন?'

'এককালে তো সম্পর্ক ছিল, সে সময়টা তো মিথ্যে ছিল না। যদি সেটাকে বন্ধুত্ব বলো তাহলে তার সুবাদে তো আসা যায়, এরকম মনে হয়েছিল আমার। ভুল মনে হয়েছিল। এখন তুমি প্রতিদিন হয়তো নতুন-নতুন প্রেমপ্রস্তাব শুনতে অভ্যস্ত। পুরোনকে ভাল লাগার কথা নয়।'

'বাঃ। চমৎকার! তুমি দেখছি বাংলা সিনেমার সংলাপ ভাল লিখতে পারবে। এখনও নিশ্চয়ই কোন কোম্পানির চাকর হওনি। হয়েছ? তা দ্যাখো না, চেষ্টা করে ফিল্মলাইনে!' হেনা মাথা ঝাঁকাতেই ওর চকচকে পালিশ করা কাঁধ ছুঁয়ে থাকা চুলগুলো চোখ গাল স্পর্শ করে গেল, 'হ্যাঁ। প্রেমপ্রস্তাবের কথা বলছিলে না? আমি স্বীকার করতে বাধ্য আজ পর্যন্ত তুমি ছাড়া আর সমস্ত পুরুষ আমাকে প্রস্তাব দেবার সময় প্রায় একই ভাষা বা শব্দ ব্যবহার করেছে অথবা একই ভঙ্গিতে কথা বলেছে। ব্যাপারটা ক্রমশ এমন একঘেঁয়ে হয়ে গিয়েছে যে আর শোনার মত ধৈর্য আমার নেই।'

'তবু তো আজ শুনতে যাচ্ছিলে?'

'হ্যাঁ। কারণ কাজের সুবাদে অরিত্রর সঙ্গে আমার আলাপ। আমি আজ যে কোম্পানিতে আছি কাল সেখানে নাও থাকতে পারি। খামোকা কাউকে চটিয়ে দিয়ে আমার কোন লাভ হবে না। তাছাড়া লোকটা ভদ্রলোক, লম্পট নয়।'

'আচ্ছা! তা আমাকে হঠাৎ আলাদা করলে কেন?'

'ওটা আমার বোকামি।'

'বোকামি?'

'তখন বয়স কম ছিল। তুমি যেসব কথা বলতে সেগুলোকে সত্যি বলে মনে হত, বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করত। জীবন সম্পর্কে তোমার এ্যাপ্রোচ ছিল নেগেটিভ। ওই বয়সে বাঁকা বাঁকা কথা শুনতে বেশ আরাম লাগত। কিন্তু সেটা বয়স বাড়ার পর নেহাৎ বোকামো বলেই মনে হয়েছে। তোমার মনের বয়স বাড়েনি বলে তুমি একই জায়গায় পড়ে আছ। তোমাকে সহ্য করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।'

'তাই যারা বানানো ক্লিশে হয়ে যাওয়া শব্দ-উচ্চারণ করে, জীবনের সঙ্গে খাপ খাইয়ে দু'নম্বরী হাসে, তাদের সহ্য করতে তোমার আপত্তি নেই।'

'না, নেই। তোমাকে আমি আগেও অনেকবার বলেছি কোটি কোটি মানুষ যা মেনে নিয়েছে তুমি তার ব্যতিক্রম হতে পারো না। এই যে তুমি এম. এ.

পাশ করেও চাকরি করনি, ব্যবসা করনি, কিভাবে টাকা রোজগার করছ, আদৌ করছ কিনা তা জানি না, তোমার ওপর কেউ নির্ভর করতে পারে? তুমি নিজে নিজের ওপর নির্ভর করতে পারো?'

'আমার তো চলে যাচ্ছে।'

'হ্যাঁ। বাবার হোটেলে দু'বেলা খাওয়া আর পৈতৃক বাড়ির ছাদ মাথার ওপর থাকলে বুলির বিপ্লব করা যায়। কিন্তু তাও ক'দিন? তেইশ কি চব্বিশ। তোমার বয়স তো তাও অনেককাল পার হয়ে গিয়েছে। এবার তাকিয়ে দ্যাখো না। দুটো পা মাটিতে রাখো!'

'যার দশে হয়নি তার এক'শতেও হবে না হেনা।'

'তার মানে চিরকাল তুমি একটি অকর্মণ্য মানুষ হয়ে বেঁচে থাকবে?

'অকর্মণ্য?' আমি হাঁ হয়ে গেলাম।

'নিশ্চয়ই। শুধু কথাসর্বস্ব মানুষকে কেউ বিশ্বাস করতে পারে? আর যে কথা আজকের যুগে অচল! তোমার ওপর কোন মানুষ আস্থা রাখতে পারবে? তুমি কারও দায়িত্ব নিতে পারবে?'

'তোমার এসব কথায় যুক্তি আছে, ছিল। আমি তাই একবছর আগে মেনে নিয়েছি।'

'তবু তুমি নিজেকে শোধরাওনি?'

'না। আজকাল আমার বমি পায়।'

'বমি পায়?'

'কেউ দু'নম্বরী কথা বললে বা জ্ঞান দিলে শরীর গুলিয়ে ওঠে। হেনা, অনেকক্ষণ থেকে আমার ওইরকম হচ্ছে। তোমার টয়লেটে যেতে পারি।'

'নোঃ।' চিৎকার করে উঠল হেনা, 'তোমার শরীরের কোন কিছু এ বাড়িতে রেখে যাবে না তুমি।'

'বমিও করতে পারব না?'

'এনি ড্যাম থিং।'

কিন্তু আমি পারলাম না। তীরের মত দৌড়ে গেলাম টয়লেটের দিকে। যেহেতু আমার জানা ছিল তাই দরজাটা খুলে বেসিনে পৌঁছাতে পারলাম শেষমুহূর্তে। ভেতর থেকে যাবতীয় আবর্জনা বেরিয়ে আসার কথা, কিন্তু কয়েক চামচ তেতো জল ছাড়া কিছু বের হল না। মুখে ঘাড়ে জল দিলাম, একটু কুলকুচি করলাম হাঁপাতে হাঁপাতে।

'তুমি কি অসুস্থ?' টয়লেটের দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে হেনা।

'না।' মাথা নাড়লাম। তখনও শরীরে কাঁপুনি হচ্ছিল।

'তাহলে?'

'এরকম হয়।'

'ডাক্তার দেখিয়েছ?'

আমি উত্তর দিলাম না। পৃথিবীর কোন ডাক্তার এর চিকিৎসা করতে পারবে না। একথা বলে কি লাভ। চলে যাওয়ার জন্যে পা বাড়াতেই হেনা বলল, 'শোনো। একটু বসে যাও।'

'কেন?'

'আমি অনুরোধ করছি।'

এই গলায় হেনা অনেককাল কথা বলেনি। আমি বসলাম। হেনা ভেতরে চলে গেল। মানুষের নিজস্ব কিছু চরিত্র আছে। এই চরিত্র এক একজনের এক একরকম। তার নিজের মতন। আবার কিছু চরিত্রে অনেকের পার্থক্য নেই। এই যেমন, সম্পর্ক যখন সহজ থাকে, মন ভাল থাকে তখন মানুষ যে গলায় কথা বলে, একবার সম্পর্ক তিক্ত হয়ে গেলে নিজের অজান্তে আর সেই গলা ব্যবহার করতে পারে না। তখন হয়তো ঝগড়া হচ্ছে না, সেদিন কোন অশান্তি হয়নি কিন্তু মন টোল খেয়ে গেলে কণ্ঠস্বর সেই যে পাল্টে যায় তা আর আগের অবস্থায় ফিরে যেতে পারে না। যদি যায় তাহলে বলতে হবে অসাধ্যসাধন করা হল। আজ হেনার ক্ষেত্রে তাই হয়েছে, এমন ভাবার তো কোন কারণ নেই।

এক গ্লাস জল নিয়ে এল হেনা, 'খেয়ে নাও।'

বিনা বাক্যব্যয়ে জল খেলাম। খুব প্রয়োজন ছিল জলের।

আমার হাত থেকে গ্লাস ফিরিয়ে নিয়ে হেনা সোফায় বসল। ও এখন কথা খুঁজছে বুঝতে পারছি। কিভাবে আমাকে বুঝবে, সেটা ভেবে পাচ্ছে না। চিরকালই ওর জ্ঞান দেবার একটু ঝোঁক আছে। ওকে সেই ফার্স্ট ইয়ার থেকে চিনি। তখন স্কার্ট পরে কলেজে যেত, দুটো বেণী পিঠে নাচতো। আমি বাংলা, ও ইকনমিক্স। আমি যখন এম. এ. ক্লাশে সময় নষ্ট করছি তখন কিসব পরীক্ষা দিয়ে হেনা চাকরিতে ঢুকে পড়েছে। ওর নিজের বাড়ি ব্যারাকপুরে। এই ফ্ল্যাটটা ওর বাবা ওকে ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। একজন খুব পুরনো মহিলা হেনার সঙ্গে একবছর আগেও থাকত। হেনাকে ছেলেবেলা থেকে দেখে আসছে। সে মহিলা কি এখন নেই?

এই সময় হেনা বলল, 'আমার খিদে পেয়েছে। তুমি একটু বসবে, দেখি কি বানাতে পারি।'

'কেন? তোমার সেই মহিলা নেই?'

'না। নাতনির বিয়েতে গেছে।' হেনা উঠে গেল।

খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম বমিটা করার পর। সোফায় শরীর এলিয়ে দিলাম। এবং তার ফলে যে কখন ঘুম এসে গেল তা বুঝতে পারিনি। যখন ঘুম ভাঙল তখন ঘড়িতে সাড়ে দশটা বেজে গেছে। ঘর অন্ধকার। হেনা এ-ঘরে নেই। হুড়মড়িয়ে উঠে বসলাম। তারপর ডাকলাম, 'হেনা।'

কোন সাড়া এল না। আমি দ্বিতীয়বার ডাকলাম, এবার একটু জোরে। কিন্তু তবু সাড়া এল না।

হেনা কি আমার মত ঘুমিয়ে পড়েছে? আমি পাশের ঘরে ঘরে ঢুকলাম। এটা তিন ঘরের ফ্ল্যাট। এর পাশেরটা হেনার বেডরুম, বেডরুমের দরজা বন্ধ। কয়েকবার নক্ করা সত্ত্বেও সাড়া এল না। ঠিক তখনই টেলিফোনটা আওয়াজ করে উঠল। শব্দটা এমন আকস্মিক যে আমি ছিটকে উঠেছিলাম। আমি আবার বন্ধ দরজায় আঘাত করলাম, 'তোমার টেলিফোন, প্লিজ দরজা খোল।'

তবু দরজা খুলে বেরিয়ে এল না হেনা। এটা রসিকতা হলে মোটা দাগের রসিকতা। আর নিজের নিরাপত্তা সম্পর্কে সন্দেহ আছে বলে হেনা দরজা দিয়েছে, এমন ধরে নিলে আর দরজায় আঘাত করে ওর চৈতন্য জাগানোর কোন মানে হয় না। তার চেয়ে রিসিভারটা তুলে বলে দিই আজ রাত্রে ফোন করে কোন লাভ নেই।

রিসিভার তুলতেই মনে হল কী শান্তি। ছোট ফ্ল্যাটে রাত বাড়লে শব্দ ভয়ঙ্কর হয়ে যায়।

'হ্যালো!' গম্ভীর হয়ে বললাম।

'যাক। তোমার ঘুম শেষপর্যন্ত ভেঙ্গেছে।' হেনার গলা।

'আরে তুমি? তুমি কোত্থেকে বলছ?' আমি হতভম্ব হয়ে বন্ধ দরজাটা দেখলাম।

'তখন তোমাকে বলার সুযোগই হল না। আমি সাড়ে নটা নাগাদ ডিনারে বেরিয়েছি। খুব ভাল বড় পার্টি হচ্ছে এক বান্ধবীর বাড়িতে। তুমি এমন মড়ার মত ঘুমাচ্ছিলে যে তোমাকে আর ডিস্টার্ব করিনি আসার সময়। এখন তো রাত হয়ে গেছে। তুমি নিশ্চয়ই চলে যাবে। যাওয়ার সময় দরজাটা টেনে দিয়ে যেও।

প্লিজ! রাখছি।'

ওপাশে রিসিভার রাখার আওয়াজ হল। ফোন নামিয়ে ধাতস্থ হতে সময় লাগল আমার। বন্ধ দরজাটার দিকে তাকালাম। ওর ভেতরে কেউ নেই অথচ কত আজেবাজে ভাবনা মাথায় আসছিল বন্ধ দরজা দেখে। এমন তো হতেই পারে, হেনার আগে থেকেই নেমন্তন্ন ছিল। আমাকে ওভাবে ঘুমোতে দেখে ও কেন নেমন্তন্ন বাতিল করবে?

কিন্তু খিদে পাচ্ছে খুব। আমি শেষ কখন খেয়েছি? দুপুরে। রুটি আর আলুর দম। আমার কাছে পয়সা ছিল, বিকেলে যাহোক কিছ্ খেয়ে নিতে পারতাম। কিন্তু সঙ্গে লোক থাকলে ওই হয় মুশকিল। প্রকাশকের গাড়ি করে রবীন্দ্রসদনে গিয়েছিলাম। ওঁর উচিত ছিল আমাকে খাওয়ার কথা বলা। বলেননি। আমি যা খাবো তা উনি খাবেন না বলেই আমি কিছু বলিনি।

কিচেনে ঢুকলাম। ফ্রিজ ভর্তি খাবার। মাংস-মাছ সব রান্না করা হয়েছে। এমনকি ভাতও। কিন্তু গরম না করে খাওয়া যাবে না। হেনা কি তিন চার দিনের রান্না একসঙ্গে রেঁধে ফ্রিজে ঢুকিয়ে রাখে? মিষ্টির বাক্সটা দেখলাম। নাঃ। চলবে না। ফ্রিজ বন্ধ করে হটবক্সটা দেখলাম। কিছুই নেই ভেতরে। কিন্তু হেনা বলেছিল কিছু বানাতে কিচেনে যাচ্ছে। কি বানিয়েছে তখন?

পেলাম শেষ পর্যন্ত। একটা সসপ্যানের মধ্যে চাপা দেওয়া ছিল। মোটা সোটা ওমলেট আর চার পিস টোস্ট। ওমলেট একটাই। তার মানে হেনার নিজেরটা খেয়ে গেছে। স্বাভাবিক। অফিস থেকে ফিরে এসে অভুক্ত অবস্থায় কেউ পার্টিতে যায় না।

ঠাণ্ডা ওমলেট এবং শীতল টোস্ট ক্ষুধার্তের জিভে কোন বিস্বাদ আনে না। খাওয়া হয়ে গেলে শরীরে বল পেলাম। এবার ফেরা যাক। রাত ঢের হয়েছে। এরপরে বাস পাব না। ট্যাক্সিতে চেপে বাড়ি ফেরার বিলাসিতা আমি এ্যাফোর্ড করতে পারি না। কিন্তু বাইরের দরজা খুলতে যাওয়ার সময় মনে হল হেনার সঙ্গে আমার কোন কথাই হল না। একবছর ধরে না আসার কারণে যে ব্যবধান ছিল তা আর কখনই না এলে নিশ্চয়ই আরও বেড়ে যেত। কথা বলার কোন প্রয়োজনই হত না। কিন্তু আজ সন্ধেবেলায় কথাগুলো নতুন করে উঠেছিল। সেটা শেষ করতে হলে আমাকে আবার এই ফ্ল্যাটে আসতে হয়। ওই আবার আসা হেনা পছন্দ করবে না। তাই সাপ ব্যাঙ যা হোক আজই শেষ করে যাওয়া ভাল। যতই রাত হোক, কলকাতার রাস্তায় কেউ পড়ে থাকে না।

তবে বাড়িতে যে খাবার আমার জন্যে বরাদ্দ সেটা নষ্ট করার অধিকার আমার নেই। আমার জন্যে খাবার না রাখার জন্যে বলে দেব বলে ফোনের দিকে এগোলাম। ডায়াল করতে গিয়ে থমকে গেলাম। যাচ্চলে! আমার বাড়ির নাম্বারটা যেন কত? ঝাপসা ঝাপসা লাগছে কিন্তু কিছুতেই মনে করতে পারছি না। অদ্ভুত যন্ত্রণা শুরু হল। তারপরেই মনে হল ওটা আমার বাড়ি ভাবলাম কেন? যে বাড়িতে আমি থাকি, মানে রাত্রিবাস করি, সেটা আমার বাড়ি হবে কেন? ওটা আমার পিতার বাড়ি। পিতা? ধ্যাৎ! পিতা বললেই কিরকম মুনিঋষি সাধুসন্ত সেইন্টদের ছবি মনে আসে। বাবা শব্দটার মধ্যে ওগুলো অতটা না হলেও কিছুটাতো থাকছেন। বাপ শব্দটা বরং অনেক বেশি সহজ। কোন স্ট্যাম্প নেই। মেয়েরা যদি বাপের বাড়ি বলতে পারে তাহলে ছেলেরাই বা বলবে না কেন? এইটুকু ভাবতেই নাম্বারটা মনে এসে গেল।

ওপাশে ফোন বাজছে। আমার বাপ বাড়িতে থাকলে এখন তাঁর আহ্নিকের সময়। নিশ্চয়ই ভাই ফোনটা তুলবে। কিন্তু কেউ সাড়া দিল না। ফোনটা বেজে যাচ্ছে তো যাচ্ছেই। লাইনটা কেটে আবার ডায়াল করলাম। একই অবস্থা। এমনটা হতেই পারে না। নিশ্চয়ই ফোন খারাপ হয়েছে। বাড়ি খালি করে সবাই অন্য কোথাও কিছুতেই চলে যেতে পারে না। ওয়ান নাইন নাইনে ফোন করলাম। মিনিট তিনেক বাজল কিন্তু দিদিমণিরা সাড়া দিলেন না।

শেষপর্যন্ত হাল ছেড়ে দিলাম। ঘড়ি বলছে এগারটা বেজে গিয়েছে। এবার বেরুতে হয়। আলো নিভিয়ে দিতেই দরজায় শব্দ হল। বাইরে থেকে চাবি ঘুরিয়ে কেউ দরজা খুলছে। চোর নাকি? দ্রুত সরে এলাম এক কোণে! চোর হলে হেনার উপকার করে যাওয়া উচিত। আলমারির আড়ালে দাঁড়ালাম।

কিন্তু হেনারই গলা বাজল, 'তোমাদের অনেক ধন্যবাদ পৌঁছে দেবার জন্যে।'

টুক করে আলো জ্বলল। হেনা এত তাড়াতাড়ি ফিরে এল। আমি ঘড়ি দেখলাম। যাচ্চলে। আমি এতক্ষণ কি দেখছিলাম? এগারটা নয়, বারোটা বেজে গেছে।

একটি মহিলা কণ্ঠ বলল, 'টয়লেট কোথায় হেনা?'

'ওইতো, ওইদিকে। যাও।' হেনার গলা। তারপরেই টয়লেটের দরজা বন্ধ হবার শব্দ হল।

সঙ্গে সঙ্গে একটি পুরুষ কণ্ঠ শুনলাম। চাপা গলায় বলছে, 'হেনা! আমি আর পারছি না।'

'কেন? শরীর খারাপ?' হেনা খুব সিরিয়াস।

'ওঃ। ঠাট্টা করো না। আই নিড ইউ হেনা, আই লাভ ইউ

'প্লিজ সুমিত! তোমার বউ শুনলে দুঃখ পাবে।'

'আই ডোন্ট কেয়ার! আমি আর ওর সঙ্গে থাকতে পারছি না। আই নিড ইউ।'

'রিয়েলি?'

'জাস্ট টেল মি ইয়েস।'

'তোমার বউ-এর সামনে বলতে পারবে?'

'তুমি আমাকে পরীক্ষা করছ?'

'না। কিন্তু মুশকিল হল, তুমি একবারও জানতে চাইছ না আমি ফ্রি আছি কিনা!'

'তার মানে?'

'আমি তো অন্য কারো সঙ্গে এনগেজড্ হয়ে থাকতে পারি!'

'মাই গড!'

'কেন? পারি না?'

'সেই ভাগ্যবানটি কে?'

'তুমি চিনবে না। আমরা একসঙ্গে কলেজে পড়তাম।'

'হেনা, তুমি আমাকে ব্লাফ দিচ্ছ না তো?'

হেনাকে উত্তর দিতে হল না কারণ সেইসময় টয়লেটের দরজা খুলে গেল। আশ্চর্য দু'নম্বরী লোক তো। বউ টয়লেটে যাওয়া মাত্র অন্য মহিলাকে প্রেমের প্রস্তাব দিচ্ছে? ইচ্ছে হচ্ছিল বাইরে বেরিয়ে এসে লোকটার কলার ধরি। কিন্তু মহিলা বললেন, 'চলো। এলাম ভাই।'

'এসো। আবার বলছি অনেক ধন্যবাদ এখানে আসার জন্যে।' হেনার গলা।

দরজা বন্ধ হল। আলো নিবল। নিবল বলেই সামনে দিয়ে যাওয়ার সময় হেনা আমাকে দেখতে পেল না। শোওয়ার ঘরে ঢুকে গেল সে। ঘরে আলো জ্বলল। গুনগুন করে সুর ভাঁজছে হেনা। মনে বোধহয় আনন্দ এসেছে। কেন? এই যে একের পর এক অবিবাহিত বা বিবাহিত পুরুষেরা ওকে প্রেম নিবেদন করছে, তাই? কিন্তু ব্যাপারটা কি? এই দু'নম্বরী লোকটাকেও হেনা যার কথা বলল সে আমি ছাড়া কেউ নয়। অথচ এখন হেনা আমার সঙ্গে প্রেম করছে না। কিন্তু প্রেমিকদের কাটাবার জন্যে আমার নাম ব্যবহার করছে। কেন?

হেনা বেরিয়ে এল। এখন ওর পোশাক পাল্টে গেল। হালকা নীল এবং বেশ পাতলা একটা হাতাকাটা নাইটি পরেছে। এক পলক দেখতে পেলাম, তারপরেই কিচেনে ঢুকে আলো জ্বালল। গুনগুনানি বন্ধ হচ্ছে না এখনও। আমি এখন কি

করি। চোরের মত এখানে দাঁড়িয়ে থাকাটা আর ভাল দেখাচ্ছে না। আমি যে যাইনি, এই বাড়িতেই ছিলাম, তাও হেনা পছন্দ করবে না। অথচ এখন দরজা খুলে বেরুতে গেলেই আমি ওর কাছে ধরা পড়ে যাব।

তখনই কিচেনের আলো নিবিয়ে বেরিয়ে এল হেনা। একটু দাঁড়াল। তারপর টেলিফোনের সামনে গেল। আমি ওর পেছনটা দেখতে পাচ্ছি। হেনার ফিগার খুব ভাল। আজকাল চুলে নানান কায়দা করায় গ্ল্যামার বেড়ে গেছে। ওপাশের আলো জ্বেলে নিয়ে হেনা ডায়াল করল। কয়েক সেকেন্ড বাদেই সে "হ্যালো" বলল।

'হ্যালো। আমি খুব দুঃখিত এত রাত্রে আপনাদের বিরক্ত করছি বলে। আসলে বিপ্লব আমার এখানে একটু দেরি করে বের হয়েছে। ও ঠিকঠাক বাড়িতে পৌঁছালো কিনা সে ব্যাপারে চিন্তায় ছিলাম। কি বললেন? এখনও পৌঁছায়নি? অদ্ভুত! আমি? আমি ওর সঙ্গে একসময় কলেজে পড়তাম। আমার নাম হেনা। আপনি? ওহো, না মেসোমশাই, আমি আগে কখনও ফোন করিনি। নাম্বারটা লেখা ছিল। কি বললেন? এটা ঠিক, আপনি নিশ্চয়ই আপনার ছেলেকে চেনেন। ওকে কনভিন্স করা খুব ডিফিকাল্ট। ও, তাই? এ তো খুব ভাল ব্যাপার। এন. আর আই-দের সঙ্গে? বাঃ। আচ্ছা, ঠিক আছে, না না, তার দরকার নেই। আজ রাত্রে আর ফোন করতে হবে না। নিশ্চয়ই পৌঁছে যাবে। গুডনাইট।'

আমি হতভম্ব হয়ে শুনছিলাম। আমার বাপের এখন সুখনিদ্রা দেওয়ার সময়। এই সময় তিনি ফোন তুললে ক্ষেপে যাওয়ার কথা, এক পার্টির বড়কর্তার ফোন যদি না হয়। আজ হেনা যে গলায় বলল তাতে মনে হল তিনি বেশ ফূর্তিতে আছেন। আর হেনার ব্যাপারটা কি? কোনদিন ও সত্যিই ফোন করেনি। আজ সে পৌঁছালো কিনা তা জানতে এত উদ্বিগ্ন হবে কেন?

হেনা তার ঘরে চলে গেল। ঠিক করলাম ও ঘুমিয়ে পড়লে এখান থেকে বেরিয়ে যাব। কিন্তু কাঁহাতক এভাবে দাঁড়িয়ে থাকা যায়? আমি অন্ধকার ঘরে পা টিপে টিপে সোফার কাছে গেলাম। তারপর প্রায় নিঃশব্দে সোফায় বসে পড়লাম। আঃ, আরাম।

হেনার এই ফোন করাটা আমাকে খুব ডিস্টার্ব করছে। এত রাত্রে ফোন করে বাবার সঙ্গে কথা বলা মানে ও ইচ্ছে করেই জানিয়ে দিল ওর সঙ্গে আমার সম্পর্ক আছে। কেন? বাবাকে জানিয়ে ওর কি লাভ যখন সম্পর্কটা নেই।

ভেতরের ঘরের টিউব নিবল এবং একটা হালকা নীল আলো জ্বলে উঠল।

আর বড়জোর মিনিট পনের। তার মধ্যেই ওর ঘুমিয়ে পড়ার কথা। আমি ঘড়ি দেখতে লাগলাম। অন্ধকারে ঘড়ির ভেতর যেভাবে জ্বলে তাতে রহস্য আরও বেড়ে যায়।

পনের মিনিট বাদে উঠে দাঁড়িয়ে মনে হল হেনা ঘুমিয়েছে কিনা দেখে তবেই দরজা খোলা উচিত। নইলে খুলতে গেলে যে শব্দ হবে তাতেই হেনা সজাগ হয়ে যাবে।

নিঃশব্দে ওর বেডরুমের দরজার পাশে পৌঁছে গেলাম। উঁকি মারতেই আমার শরীরে বিদ্যুতের তরঙ্গ প্রবাহিত হল। উপুড় হয়ে বালিশে মুখ গুঁজে শুয়ে আছে হেনা। সেই নাইটিটা পাশে খুলে রেখেছে। এখন ওর অঙ্গে শুধু অন্তর্বাস ছাড়া কিছু নেই। ওই নীল আলো ওর শরীরে খোলা জায়গায় পড়ে অপূর্ব মায়া সৃষ্টি করেছে। আমার মনে তীব্র বাসনা জাগল ওই জায়গা স্পর্শ করতে। এমন আকর্ষণ আমি কখনও অনুভব করিনি। এক পা এগিয়েই আমি থেমে গেলাম। হঠাৎই নিজেকে চোর বলে মনে হল।

চুপচাপ ফিরে এলাম। মাথার মধ্যে যেন আগুন ছড়িয়ে পড়েছে। কিছুই ভাবতে পারছি না। শুধু মনে হচ্ছিল এখান থেকে বেরিয়ে গেলে আমি বেঁচে যাব। দরজা খুললাম। সামান্য শব্দ বাজল। বন্ধ করলে সেটা দ্বিগুণ হল। মনে হল হেনার গলা শুনতে পেলাম। ও কি জেগে উঠে 'কে' বলল। লিফট বন্ধ। তাড়াতাড়ি সিঁড়ি দিয়ে নীচে নামতে লাগলাম। যত তাড়াতাড়ি পারি এখান থেকে বেরিয়ে যেতে চাই।

নীচে নেমেই দেখতে পেলাম গেট বন্ধ। সেখানে তালা ঝুলছে। বের হবার কোন উপায় নেই। কি করা যায়? দারোয়ান নিশ্চয়ই তালাচাবি দিয়ে অন্য কোথাও চলে যায়নি? লোকটাকে খোঁজার চেষ্টা করলাম উঁকি মেরে। এদিকের আলো জ্বলছে না। দারোয়ানকে দেখতে পেলাম না। সারারাত এখানে দাঁড়িয়ে থাকা ছাড়া আমার কোন উপায় নেই।

মিনিট পনের বাদে মনে হল ওপরেই উঠে যাই। হেনাকে ডেকে তুলে বলি সব কথা। আমার কোন মতলব ছিল না এই থেকে যাওয়ার পেছনে। ঠিক সেই সময় কেউ একজন হাঁকল, 'কে? কে ওখানে? কৌন হ্যায়?'

চিৎকারটা এত জোরে যে আমি ঝটপট সরে এলাম। ওই লোকটাই কি এই বাড়ির দারোয়ান? এই সময় দ্বিতীয় গলা শোনা গেল, 'কেয়া হুয়া সেলিম ভাই?'

'একটা লোককে দেখলাম গেট থেকে সরে যেতে। তালা খোল, জলদি।'

এইবার হাতেনাতে ধরা পড়ার চেয়ে লুকিয়ে পড়া ভাল। নাকি, এগিয়ে গিয়ে

বলব, 'আমি চোর নই। হেনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলাম কিন্তু গেট বন্ধ হয়ে গিয়েছে তা জানতাম না।' যুক্তিটা জলো বলে মনে হল। হেনা নিশ্চয়ই জানে কখন গেট বন্ধ হয়। সেক্ষেত্রে সে নিশ্চয়ই তার কাছে রাখা চাবি দিয়ে দরজা খুলে দিত। ওরা আমাকে হেনার কাছে ধরে নিয়ে যাবে সত্যিই বলছি কিনা জানার জন্যে। তখন হেনা কি বলবে?

দ্রুত দৌড়ে ওপরে উঠলাম। হাঁপাতে হাঁপাতে দরজার সামনে পৌঁছে বেল বাজালাম। মিনিট খানেক গেল, মনে হচ্ছিল অনেক সময়। নীচে হল্লা বাড়ছে। এই সময় দরজা খুলল হেনা। তার পরনে এখন হাউসকোট। আমাকে দেখে সে হতভম্ব, 'তুমি?'

তাড়াতাড়ি ভেতরে ঢুকে দরজা বন্ধ করলাম। তখনও নিঃশ্বাস স্বাভাবিক হয়নি।

'তুমি এখানে কি করে এলে?' প্রায় চিৎকার করে উঠল হেনা।

'প্লিজ! চুপ করো। সব বলছি।' আমি মিনতি করলাম।

'কিন্তু—!'

'আমি তোমাকে বিরক্ত করছি কিন্তু কোন উপায় নেই। যদি কেউ এখানে খোঁজ করতে আসে তাহলে বলবে আমি এখানে আসিনি।'

'এই বাড়িতে ঢুকলে কি করে?'

'আমি এখান থেকে বের হইনি'। সোফায় বসে হেনাকে সব খুলে বললাম।

হঠাৎ হেনার চোখমুখ অন্যরকম হয়ে গেল, 'আমি শুয়ে পড়ার পর তুমি আমার বেডরুমে গিয়েছিলে? সত্যি কথা বল?'

'না।' বলেই মনে হল, মিথ্যে বলে কি লাভ, 'ভেতরে যাইনি। দরজা পর্যন্ত গিয়ে দেখেছিলাম তুমি ঘুমিয়ে পড়েছ কিনা। আই অ্যাম সরি।'

'ভেতরে গিয়ে ডাকোনি কেন?'

'এ্যাঁ?'

'ভেতরে ঢুকে আমাকে ডাকোনি কেন?'

'আমার মনে হয়েছিল ঘুম থেকে উঠে আমাকে দেখে তুমি রেগে যাবে।'

'অদ্ভুত। আচ্ছা, বল তো, তুমি আর কতদিন আমাকে জ্বালাবে?'

'আমি চাইনি।'

'এখন কি করবে। এত রাত্রে এখান থেকে আমি যদি তোমাকে নিয়ে গিয়ে গেট খুলে দিই তাহলে কাল সবাই গল্পটাকে নানান রঙে সাজাবে। উঃ।'

'আমি এখানেই থাকছি। সকাল হলে গেট খুললে বেরিয়ে যাব। আমাকে নিয়ে

তুমি চিন্তা করো না। যাও, শুয়ে পড়। তোমাকে এভাবে বিরক্ত করার জন্যে সত্যি আমি দুঃখিত।'

'দুঃখিত! শব্দটাকে অর্থহীন করে দিলে তুমি।'

'যাও। শুয়ে পড়।'

'কি ভাবে?'

'তার মানে?'

'একই ফ্ল্যাটে একজন পুরুষ বাইরে বসে থাকলে আমার ঘুম আসবে?'

'দরজাটা বন্ধ করে দাও।'

'বেডরুমের দরজা আমি কখনও বন্ধ করি না।'

'ও। আমি প্রমিজ করছি, ওদিকে যাব না। বিশ্বাস করো।'

'আমি বিশ্বাস করি না। তুমি একবার গিয়েছ, আবার যেতে পার। তখন সাহস পাওনি, এখন। তাছাড়া আমি হাউসকোট বা শাড়ি পরে শুতে পারি না। তুমি এ ঘরে থাকলে এগুলো ছেড়ে শোওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়।'

হঠাৎ আমার মনে হল বড্ড বাড়াবাড়ি করছে হেনা। বললাম, 'যা ইচ্ছে তাই করো তাহলে। আলো নিবিয়ে চলে যাও, আমার খুব ঘুম পাচ্ছে।'

হেনা চলে গেল। আলো নেবাল না। আমি চোখ বন্ধ করার চেষ্টা করলাম। বাপ নিশ্চয়ই আজ রাত্রে অনেক কিছু ভেবে নিয়েছে। কাল বাড়িতে গেলে 'গেট আউট' বললে অবাক হব না। পরিস্থিতি যেরকম হবে সেইরকম কাজ করতে হবে। আগেভাগে ভেবে কোন লাভ নেই। তন্দ্রা এসে গিয়েছিল। চেয়ারের ওপর পা ছড়িয়ে দিয়ে সোফায় হেলান দিতে ঘুম এসে গেল। কিন্তু সেটা বেশিক্ষণ স্থায়ী হল না।

হাঁটুতে মৃদু আঘাত লাগতেই ঘুম ভেঙ্গে গেল। তাকিয়ে দেখলাম প্রায় রণরঙ্গিনী মূর্তি ধরে হেনা দাঁড়িয়ে আছে। সে বলল, 'ওঠো!'

'কেন?'

'আমার ফ্ল্যাটে তুমি আরাম করে ঘুমাবে আর আমি ঠায় জেগে থেকে সেটা দেখব এটা হতে পারে না।'

'তুমি ঘুমাচ্ছো না কেন?'

'কারণ আমি মানুষ। তোমার মত এ্যাবনর্মাল নই যে সুইচ টিপলেই ঘুম চলে আসবে। তোমাকে এখানে থাকতে হলে জেগে থাকতে হবে, নইলে চাবি দিচ্ছি বেরিয়ে যাও, যাওয়ার সময় আমার লেটার বক্সে চাবিটা ফেলে দিয়ে যেও।'

'এত রাত্রে আমি কোথায় যাব?'

'তুমি তো আমার অনুমতি নিয়ে এখানে থাকোনি।'

'বেশ। দাও চাবি।'

'বাঃ। তবু তুমি জেগে থাকবে না?'

'তোমার উদ্ভট ইচ্ছে পূর্ণ করার কোন মানে হয় না।'

'কে উদ্ভট? আমি না তুমি? এম. এ. পাশ করে বেকার বসে আছ, কি না, আমি দু'নম্বরী উপায়ে পাওয়া চাকরি নেব না। ভালবাসব অথচ যাকে ভালবাসি তাকে নিরাপত্তা দেব না। তোমার মত সুবিধেবাদী অলস অকর্মণ্যরাই একথা বলে। এই সমাজে তুমিই নিজেকে উদ্ভট করে রেখেছ।'

'বেশ। তুমি আমাকে কি করতে বল?'

'আমার কিছু বলার নেই।'

'প্লিজ, হেনা।'

হেনা আমার দিকে তাকাল, 'বেশ। পারবে তুমি তোমার বাবার অফার অ্যাকসেপ্ট করতে? এন. আর. আই-দের সঙ্গে ব্যবসা শুরু করতে পারবে?'

'তুমি বুঝতে পারছ না ওটা করতে গেলে বাপের দু'নম্বরী ক্ষমতার সাহায্য চাই। পার্টি, রাইটার্স বিল্ডিং, সর্বত্র বাপের প্রতিপত্তি খাটিয়ে কাজ আদায় করতে হবে। যার এই সুযোগ নেই সে বেচারা কোনদিন যা পাবে না আমি তা সহজেই পেয়ে যাব। আমাকে তুমি এই অন্যায় করতে বলছ?' আমি বোঝাবার চেষ্টা করলাম।

'অন্যায়? এই যে এখানে একজন অবিবাহিতা একা মহিলার ফ্ল্যাটে মধ্যরাতে তুমি দাঁড়িয়ে আছ যার সঙ্গে তোমার কোন লিগ্যাল সম্পর্ক নেই, এটা অন্যায় নয়? এতই যখন তোমার আপত্তি তাহলে এখানে পড়ে আছ কেন? জঙ্গলে বা পাহাড়ে চলে যাও। সেখানে হয়তো এত সমস্যা থাকবে না।' হেনা ছুটে ভেতরে চলে গেল। ফিরে এল চাবি নিয়ে। টেবিলের ওপর ছুঁড়ে দিয়ে বলল, 'গেট লস্ট!'

চাবিটা তুলে বেরিয়ে এলাম। নীচে নেমে তালা খুলতেই একজন এগিয়ে এল, 'আপনি কোন ফ্ল্যাট থেকে আসছেন স্যার?'

উত্তর দিলাম। লোকটা দ্বিতীয় প্রশ্ন করার আগে বাইরের দেওয়ালে টাঙানো লেটার বক্সগুলোর মধ্যে যেটার বুকে হেনার নাম লেখা তার গর্তে চাবিটা ফেলে দিয়ে হাঁটতে লাগলাম। কিছুক্ষণ হাঁটার পর দেখলাম রাস্তা সুনসান। আলোগুলো হল্‌দেটে লাগছে। ফুটপাতে দাঁড়িয়ে মনে হল, সত্যি কি আমি উদ্ভট? হেনাকে

আজ কত বছর হয়ে গেল বন্ধু বলে নিয়েছিলাম। কিন্তু আজ পর্যন্ত আমি একবারও ওকে চুমু খাইনি। কলেজে পড়ার সময় এসব ব্যাপারে যারা অভিজ্ঞ তারা কতবার জিজ্ঞাসা করেছে আমাদের সম্পর্ক কত দূর এগিয়েছে? চুমু খাওয়া ওদের কাছে হাত মেলানোর মত সহজ ব্যাপার ছিল, ওরা আরও এগিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু হেনার সঙ্গে ঘণ্টার পর ঘণ্টা গল্প করলেও ওসব ভাবনা আমার মাথায় আসেনি। হেনা যখন চাকরি নিল, ওর ব্যাচেলার মামার এই ফ্ল্যাটে উঠে এল তখন তো অনেক সময়ই একা পেতাম। মামা মারা যাওয়ার পর তো কোন ভয় ছিল না। তাহলে? আমি কি একজন ছেলেবন্ধুর থেকে হেনাকে আলাদা করিনি? এটা উদ্ভট নয়? একজন আমার বয়সী ছেলে হেনার মত সুন্দরী মহিলাকে প্রেমিকা হিসেবে পেয়ে শরীর সম্পর্কে নিস্পৃহ থাকবে কি?

আমি উদ্ভট না মিসফিট? এই জগৎসংসারে সবাই যেমন চলছে তেমন চলতে পারি না কেন? এই সব প্রশ্ন যখন মনে আসছিল ঠিক তখন একটা মারুতি ভ্যান দ্রুত গতিতে পাশ দিয়ে চলে যেতে যেতে ব্রেক কষে দাঁড়াল বেশ খানিকটা দূরে। গাড়িটা বেশ কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকল। তারপর ব্যাক করে চলে এল আমার পাশে। গাড়ির কাচ কালো, ভেতরে ঠাণ্ডা মেশিন চললে বলেই বোধহয় সেগুলো নামানো হয়নি। ড্রাইভারের পাশে আসনে যে বসেছিল সে কাচ নামিয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'আচ্ছা, টাইগার সিনেমাটা কোন দিকে পড়বে?'

কলকাতায় বাস করে টাইগার চেনে না এমন হতে পারে না। বুঝলাম এরা নতুন। আমি জায়গাটা বুঝিয়ে দিচ্ছিলাম কিন্তু লোকটা বুঝতে পারছিল না। হঠাৎ মনে হল ওরা যদি আমাকে লিফট দেয় তাহলে আমি ধর্মতলা পর্যন্ত এগিয়ে যেতে পারি আর ওদেরও উপকার হবে। লোকটি বলল, 'আমরা কলকাতায় নতুন। আপনি কি এখানে থাকেন?'

'না। আমি ওদিকেই থাকি।' বললাম, 'আপনার গাড়িতে জায়গা থাকলে সঙ্গে যেতে পারি।'

'তাই নাকি? খুব ভাল হয়। উঠে পড়ুন।'

পেছনের দরজা খুলে দিতেই গাড়িতে উঠলাম। দরজা বন্ধ করতেই গাড়ি ছুটল। আমি রাস্তা বলতে গিয়ে শুনলাম পেছন থেকে গোঙানির আওয়াজ ভেসে আসছে। চমকে পেছন ফিরে দেখলাম কেউ একজন ডিকিতে পড়ে আছে। হাত পা মুখ বাঁধা তার। আমি পাশে তাকালাম। সেখানে দু'জন লোক বসে আছে নিস্পৃহ ভঙ্গিতে। জিজ্ঞাসা করলাম, 'এসব কি ব্যাপার?'

সামনের লোকটি বলল, 'ওর দিন হয়ে গেছে। আজ বলি হবে। আমরাই করব ঠিক ছিল। এখন মনে হচ্ছে সেটা তোকে দিয়ে করালে ভাল হয়। অন্তত পুলিশ জানবে আমরা খুন করিনি। চুপচাপ বসে থাক যদি প্রাণে বাঁচতে চাস। টাইগার চেনাচ্ছে।' বলা মাত্রা বাকিরা হো হো করে হেসে উঠল। মদের গন্ধ নাকে লাগল।

'আমাকে নামিয়ে দাও। থামাও গাড়ি। থামাও।' চিৎকার করে বলতেই একটা শক্ত কিছু দিয়ে পেটে আঘাত করল আমার। কক করে পেট চেপে ধরলাম। তীব্র যন্ত্রণাতে নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে এল প্রায়। লোকটি বলল, 'আবার চিৎকার করলে জন্মের মত থামিয়ে দেব।'

গাড়ি ছুটে চলেছে নির্জন রাস্তা দিয়ে। সেদিকে তাকাবার মত ক্ষমতা আমার নেই। যন্ত্রণাটা কিছুতেই কমছিল না। এরা মাস্তান না ডাকাত আমি জানি না। তবে এরা অত্যন্ত নিষ্ঠুর তা বুঝে গিয়েছি। পেছনের লোকটাকে এরা খুন করবে। আমাকে একা এত রাত্রে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে তুলে নিয়েছে কাজটা করাবে বলে। না করলে আমার ভাগ্যে কি আছে আমি জানি না।

ভ্যানটা থামতেই সামনে থেকে হুকুম হল, 'চটপট।'

ওপাশের দরজা খুলে লোক দুটো লাফিয়ে নামল। ডিকি খুলে লোকটাকে টেনে হিঁচড়ে নিচে নামাল। মনে হল এই সুযোগ পালিয়ে যাওয়ার। আমি দরজা খুলতে যেতেই সামনের লোকটা আমার দিকে রিভলভার উঁচিয়ে বলল, 'তোকে নামতে হবে না। তুই এখানে বসেই গুলি ছুঁড়বি। চালাকি আমি একদম পছন্দ করি না।'

আমি অজান্তেই মাথা নেড়ে হ্যাঁ বললাম। সেটা দেখে লোকটা জিজ্ঞাসা করল, 'আগে কখনও খুন করেছিস? করিসনি তো?'

হঠাৎ কিছু একটা ভর করল আমার ওপর। তিলজলা থেকে বাপের কাছে একটা লোক আগে প্রায়ই আসতো। বিশেষ করে ইলেকশনের সময়। লোকটার নাম মহিম গুপ্ত। মুখে কাটা দাগ ছিল। ছুরি মেরেছিল কেউ। সে এলেই বাপ সবাইকে ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে বলে। সমাজবিরোধী হিসেবে লোকটার নাম কয়েকবার কাগজে বেরিয়েছে। আজ হঠাৎ সেই মহিম গুপ্তকে মনে পড়ল। পড়তেই বললাম, 'শেয়ার দিতে হবে।'

'তার মানে?' খিঁচিয়ে উঠল সে।

'আমি মহিমের জন্যে দাঁড়িয়ে ছিলাম।'

'মহিম? কোন মহিম।'

'তিলজলার মহিম গুপ্ত। ও শেয়ার ছাড়া কোন কাজ করে না। আমি করাও

যা আর ওর করাও তা। চেনা যাচ্ছে?'

লোকটা হঠাৎ দরজা খুলে নেমে গেল। ওর সাকরেদদের সঙ্গে কথা বলল। তারপর এগিয়ে এসে জিজ্ঞাসা করল, 'তোমার আস্তানা কোথায়?'

তুই থেকে তুমিতে উঠেছি দেখে সাহস বেড়ে গেল। জায়গাটা বললাম। তারপর জিজ্ঞাসা করলাম, 'মহিমকে ফোন করবে? ও আমার বাপের চামচে?'

'চামচে? তোমার বাপের নাম কি?'

জবাব শুনে লোকগুলো এর ওর দিকে তাকাল। তারপরেই মুখের চেহারা বেশ বদলে গেল লোকটার, 'খুব ভুল হয়ে গেছে দাদা। একদম সেমসাইড করে ফেলেছি। কিছু মনে রাখবেন না। আপনার বাবা কিংবা মহিমকে জানানোর দরকার নেই।'

'এ কে?'

'বহুৎ হারামি। আমাদের কয়েকজনকে ফাঁসিয়েছে। আজ মওকা বুঝে তুলেছি। এই উঠে পড়।' লোকটা হুকুম করতেই বাকিরা উঠে পড়ল। গাড়িতে ওঠার আগে সামনের সিটের লোকটা রিভলভারে ট্রিগার টিপল। দু'বার। দুটো শব্দ বাজল। দেখলাম লোকটা পাশ ফিরে পড়ে আছে হাত-পা বাঁধা অবস্থায়। অন্ধকারে রক্ত বের হয়েছে কিনা বোঝা গেল না।

গাড়ি চলেছে ফুল স্পিডে। আমার চোখের সামনে একটা মানুষ খুন হয়ে গেল কিন্তু আমার কোন প্রতিক্রিয়া নেই? উল্টে আমাকে খুন করতে হল না বলে হাঁপ ছেড়ে বেঁচেছি। যদি মহিমের নামটা মুখে না আসত তাহলে ওরা আমাকে বাধ্য করত খুন করতে। আমার অন্য কোন পথ ছিল না। কিন্তু বাপের নামটা শোনামাত্র ওরা পালটে গেল কেন? ওই মহিম গুপ্তের নাম ওদের এতখানি বিচলিত করেনি। বাপ জানতাম সরকারি মহলে খুব প্রতিপত্তিশালী নেতা কিন্তু সমাজবিরোধীরাও এত খাতির করে?

ওরা গাড়ি ছুটিয়েছে নর্থের দিকে। জিজ্ঞাসা করলাম, 'এদিকে?'

'আপনাকে নামিয়ে দিয়ে আসছি দাদা।'

দাদা! নামিয়ে দিয়ে আসছে? আমাদের বাড়ি চেনে নাকি? অথবা শেষবার আমার পরিচয় যাচাই করতে যাচ্ছে। যাকগে, আমারই সুবিধে হচ্ছে। বউবাজারের মোড়ে একটা পুলিশের জিপ দাঁড়িয়েছিল। দু'জন অফিসার হাত দেখিয়ে গাড়ি থামাল। একজন এগিয়ে এসে জিজ্ঞাসা করল, 'কি ব্যাপার? এত রাত্রে, কোথায় যাওয়া হচ্ছে? কার গাড়ি?'

সামনে বসা লোকটি বলল, 'কাজ ছিল।' আমার বাপের নাম বলে বলল, 'ওর ছেলেকে পৌঁছে দিতে যাচ্ছি বাড়িতে। আপত্তি আছে?'

অফিসার উঁকি মেরে আমাকে দেখল, 'ঠিক আছে। যান।' গাড়ি আবার স্পিড তুলল! সামনের লোকটি হাসল, 'দাদার নাম বললে দারুণ কাজ হয়।'

আমি চুপচাপ বসেছিলাম। এসব কি হচ্ছে? যা আমি কোন কালে চাইনি, সেই কাজটাই এরা করছে। আমার এতদিনের লড়াই তাহলে বৃথা হবে। হঠাৎ নজরে এল থানা আসছে। ওই একটা জায়গায় আমি জীবনে যাইনি। তেইশ বছর বয়সে চাকরির দরখাস্ত করেছিলাম। সরকারি চাকরি। ইন্টারভিউ হয়েছিল লিখিত পরীক্ষার পরে। শুনেছিলাম পুলিশ ভেরিফিকেশনের পর অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার আসবে, খুব ভাল লাগছিল সে সময়। এই প্রথম কাউকে ধরে বা কারও দয়ায় আমি চাকরি পাচ্ছি না, একেবারে নিজের যোগ্যতায় চাকরি করতে চলেছি। ব্যাপারটা আমার বাপকে জানাইনি। একদিন সকালে একটা রোগামত লোক চোরের মত বাড়িতে এল। বাপ তখন বাড়িতে নেই। এসে বলল ওই থানার একজন অফিসার আমার সঙ্গে কথা বলতে চান। পাড়ার এক সেলুনে তিনি দাড়ি কামাচ্ছেন। আমার সঙ্গে পুলিশের কি কথা থাকতে পারে ভেবে যখন চুপ করেছিলাম তখন লোকটা বলল, 'আপনার চাকরির ব্যাপারে। বাবু খুব ভাল লোক, হয়ে যাবে। চলুন।'

গিয়েছিলাম। ওই সেলুনটায় আমরা সাধারণত ঢুকি না। সবসময় হিন্দি গান বাজানো হয়। ঢুকে দেখলাম সেলুন ফাঁকা। পুলিশ দাড়ি কামাচ্ছে বলেই বোধহয় লপেটারা তখন বাসরে। লোকটা বেশ মোটা, মুখে সাবানের ফেনা। রোগা লোকটা বলল, 'এনেছি স্যার।'

'আপনি বিপ্লবচন্দ্র?' আয়না দিয়ে লোকটা আমাকে দেখল।

'না। আমি শুধু বিপ্লব।'

'ওই একই হল। ইন্টারভিউ তো ভালই হয়েছে। আমি এক কলম ফেবারে লিখলে চাকরি। বুঝতে পারছেন? তবে আমার তো না লিখে উপায় নেই। জলে বাস করে তো কুমিরের সঙ্গে ঝগড়া করা যায় না। আপনার বাবাকে কুমির বলিনি কিন্তু 'ওটা কথার কথা।' লোকটা হাসল, 'আসলে, আপনার বাবাও জানেন, এসব কেসে আমরা কিছু পেয়ে থাকি।'

'কি পান?'

'কি পাই? যার যেমন চাকরি সে তেমন দেয়। আপনার চাকরি মন্দ নয়।'

'কেন পান?'

'কেন পাই?' লোকটা এবার সরাসরি আমাকে দেখল। মুখে সাবান থাকায় এই মুখ পরে চেনা মুশকিল হবে। তবে কপালে কাটা দাগ ছিল।

লোকটা হাসল, 'রসিকতা হচ্ছে? হেঁহে। ঘাবড়ে গিয়েছিলাম। শুনুন আমি তো আপনার বাবাকে বলতে পারব না। বললে বড়বাবু, বড়বাবু থেকে এসি, ডি সি, সিপির কানে চলে যাবে কথাটা। দিয়ে দেবে রাইটার্সের ভি আই পি গেটে ডিউটি। জীবন কয়লা হয়ে যাবে। কিন্তু আপনাকে বলতে পারি। না,না টাকা পয়সা চাই না। পোস্টিং চাই। বড়বাজারে। লালবাজারকে ধরলে কিছু করতে পারব না। আপনার বাবা যদি বলে দেন তাহলে কর্তারা না করতে পারবে না। আপনি আমার হয়ে ওঁকে রাজি করাবেন বলতে। ঠিক আছে?'

'কেন?'

'কেন? কেন মানে? আমি যে খুব ভাল রিপোর্ট দেব আপনার ফাইলে।'

'আমি আজ পর্যন্ত কোন খারাপ কাজ করিনি যে আপনি খারাপ রিপোর্ট দেবেন।'

'অ।'

'আমি যেতে পারি?'

'হেনা নামে একটা মেয়ে আপনার বন্ধু?'

হেনার নাম ওর মুখে শুনবো ভাবিনি। অবাক হয়ে বললাম, 'কেন?'

'ওর বাড়িতে যে যান তা আপনার বাবা জানেন?'

'কেন?'

'আমার রিপোর্টে সত্যি কথাটা যে লিখতে হবে। হেনাকে নিয়ে আপনি নার্সিং হোমে গিয়েছিলেন এ্যাবারসন করাতে। আপনার মর‍্যাল ক্যারেক্টার কিরকম তা জানলে এই চাকরি কি পাবেন। ভেবে দেখুন।'

'আপনি মিথ্যেবাদী। যদি পুলিশ না হতেন তাহলে আপনাকে মারতাম।' কথাটা বলার সময় চিৎকার করে উঠলাম।

লোকটা চট করে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে বলল, 'এই, দাঁড়িয়ে দেখছ কি, আমার টাইম নেই। দাড়ি কাটো।'

আমি বেরিয়ে এলাম। রাগে শরীর জ্বলছিল। কিরকম বানিয়ে গল্প বলল লোকটা। এই হল পুলিশ। বাবার নেতা এদের সভায় গিয়ে এদেরই প্রশংসা করেন! মনে হয়েছিল এত বড় মিথ্যে কাগজে কলমে কখনও লিখতে পারবে না লোকটা।

সেই রোগা লোকটা পেছন পেছন আসছিল, 'আপনি রাগ করবেন না। শুধু বাবাকে একটু বলে দিন, বাবু আপনার ভাল রিপোর্ট দেবে। বুঝতেই পারছেন।'

আমি জবাব দিইনি। চাকরিটা আমার হয়নি। ওই পুলিশ অফিসার কিরকম রিপোর্ট দিয়েছিল বোঝাই যাচ্ছে, কিন্তু কি লিখেছিল তা জানি না। বাপকে আমি কিছু বলিনি। বললেই তিনি নিশ্চয়ই আমাকে কৃতার্থ করতেন। সেটা চাইনি। ভেবেছিলাম, এমনিতেই চাকরিটা হয়ে যাবে। ভারতবর্ষে তা হয় না। এদেশে যারা ভোট দেয় তাদের গণতান্ত্রিক অধিকার আছে। কিন্তু সেই অধিকার আদায় করতে গেলে টাকা লাগে। আর যেহেতু এদেশের নিরানব্বুই ভাগ মানুষের টাকা নেই তাই ওসব অধিকার-টধিকার কাগুজে ব্যাপার। আমি শুধু নিজের মত প্রতিবাদ করে স্বস্তি পেতে পারি, জানি সেই স্বস্তিটাও হরিণের লুকানোর মত।

থানাটার সামনে ভ্যানটাকে দাঁড় করাতে বললাম আমি। সামনের লোকটা আমার দিকে অবাক হয়ে তাকাল। খুব নরম গলায় জিজ্ঞাসা করল, 'খুব দরকার আছে ভাই?'

আমি চুপচাপ মাথা নাড়লাম। ভ্যান থামল। দরজা খুলে নেমে সোজা থানায় চলে এলাম। দুটো সেপাই বসে গল্প করছিল। তাদের জিজ্ঞাসা করলাম, 'ওসি কোথায়?'

'বড়বাবু এখন কোয়ার্টার্সে। মেজবাবু আছেন, ভেতরে যান।'

দ্বিতীয়জন জিজ্ঞাসা করল, 'কি কেস?'

আমি উত্তর না দিয়ে ভেতরের ঘরে ঢুকে দেখলাম একটা লোক গেঞ্জি গায়ে টেবিলের ওপর পা তুলে দিয়ে চেয়ারে মাথা হেলিয়ে ঘুমোচ্ছে। এই লোকটাই কি মেজবাবু? আমি পেপার ওয়েট তুলে শব্দ করতে মেজবাবুর ঘুম ভাঙ্গল। চোখ খুলে পা না নামিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কি চাই?'

'একটু আগে ময়দানে একটা মার্ডার হয়েছে।'

'কোথায়?'

'ময়দানে। লোকটাকে গুলি করে মারা হয়েছে। আমি নিজের চোখে—।'

হাত তুলে থামতে বললেন মেজবাবু, 'ময়দান আমাদের জুরিসডিকসন নয়। যত্তসব ঝুট ঝামেলা। এই এলাকায় খুন হলে আসবেন। যান।'

'দেখুন, যারা খুন করেছে তারা থানার বাইরে গাড়িতে বসে আছে।'

'এ্যাঁ?'

'হ্যাঁ। আপনি এখনই ওদের এ্যারেস্ট করুন।'

'ইয়ার্কি মারছেন? ময়দানে খুন করে কেউ আমার থানার সামনে এসে অপেক্ষা করবে ধরা দেওয়ার জন্যে। রাতবিরেতে ইয়ার্কি মারছেন?'

'বেশ চলুন। ওদের সঙ্গে রিভলবার আছে কিন্তু।'

রিভলবার শব্দটায় কাজ হল। মেজবাবু লাফিয়ে উঠে হাঁকাহাঁকি করতে লাগলেন। মিনিট দুয়েকের মধ্যে রণসাজে সজ্জিত হয়ে বাইরে বার হওয়া মাত্র মারুতিটা সোঁ করে বেরিয়ে গেল সামনে থেকে। ধর ধর করেও তার নাগাল পাওয়া গেল না। আমার দেরি দেখে বোধহয় আগেই ইঞ্জিন চালু করে রেখেছিল।

মেজবাবু মিলিয়ে যাওয়া গাড়ির দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'ওই গাড়িতে ক'জন ছিল বলুন তো?'

'ড্রাইভারকে নিয়ে চারজন।'

'হুম। গাড়ির নাম্বারটা নোট করেছেন?'

মনে করতে পারলাম না। গাড়িতে ওঠার সময় সন্দেহ হয়নি, তাই নাম্বার দেখিনি। গাড়িতে বসে থাকার সময় তো নাম্বার দেখার সুযোগ নেই। আর এখানে নামার সময় যদি আমি নাম্বার দেখতে যেতাম তাহলে ওরা আমাকেই সন্দেহ করত।

'না। আমি দেখিনি।'

'তাহলে কি দেখেছেন? আসুন।' সদলবলে মেজবাবু থানায় ঢুকে গেলেন।

আমি দাঁড়িয়ে রইলাম। বেশ বুঝতে পারছিলাম থানায় গেলে আর কোন কাজের কাজ হবে না, উল্টে আমাকে ঝামেলায় ফেলবে ওরা। অথচ লোকটার গাফিলতিতে খুনিরা ধরা পড়ল না, আমি ফুটপাত ধরে হাঁটতে লাগলাম। বাঁ দিকের গলি দিয়ে গেলে পাড়ায় সর্টকাটে পৌঁছানো যায়। সেটাই ধরলাম। ময়দানে মৃতদেহ নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে। তখন টনক নড়বে মেজবাবুর। কৃতিত্ব দেখানোর জন্যে তিনি আমাকে লালবাজারে পাঠাবেন। আর সেখানে পুলিশ আমাকে জেরা করে জেরবার করে ছাড়বে। অপরিচিত লোকের গাড়িতে কেন আমি উঠলাম? অত রাত্রে ভবানীপুরের ফুটপাতে কেন দাঁড়িয়েছিলাম? কোথায় গিয়েছিলাম তার আগে? ওরা যখন কাউকে খুন করবেই আমাকে কেন সাক্ষী হিসেবে নিয়ে গিয়েছিল? আমাকে দিয়ে খুন করানোর গল্প যদি সত্যি হয়, তাহলে সেটা করল না কেন? তার ওপর ওই লোকগুলোর পরিচয় কি? বাপের নাম শুনে যদি ভয় পেয়ে থাকে, তাহলে আমার বাপ নিশ্চয়ই তাদের চেনে। এসব প্রশ্নের উত্তর ঠিকঠাক দিলেও ওরা খুশি হবে না অথচ খুনীদের ধরার কোন সম্ভাবনা থাকবে

না। আমি চেষ্টা করেছিলাম এটুকুই আমার সান্ত্বনা মেজবাবু আমাকে পরিচয় জিজ্ঞাসা করেননি। তিনি আমাকে চেনেনওনা। তাই আমার কাছে পৌঁছবার কোন রাস্তা ওঁর কাছে খোলা নেই।

বাড়ির সামনে যখন পৌঁছলাম তখন রাত সাড়ে তিনটে। পাড়া নিঝুম। বাড়িতে একটাও আলো জ্বলছে না। ভাগ্যিস আমার ঘরের একটা দরজা রাস্তার দিকে আর সেটাও তালা দিয়ে আমি বের হই। তালা খুলে ভেতরে ঢুকলাম। জামাকাপড় খুলে পাজামা পরে শুয়ে পরলাম অন্ধকারেই। বাথরুমে গেলে আলো জ্বালতে হবে। সেইটে চাইলাম না।

ঘুম ভাঙ্গল বেশ বেলায়। ভাঙ্গালো ছোটভাই। 'বাবা তোকে ডাকছে।'

বুঝলাম ঝড় উঠবে। কি আর হবে? চলে যেতে বলবেন বড়জোর। ধীরে সুস্থে বাথরুম সেরে দাঁত মেজে খবর নিলাম, এ বাড়ির চায়ের পাট শেষ হয়ে গেছে। এখন রান্নার সময়। চা পাওয়া যাবে না। জামাপ্যান্ট পরে বাপের ঘরে ঢুকলাম। ঘরে তখন বাপ ছাড়া যে লোকটি বসে আছে তাকে দেখেই চিনতে পারলাম, মহিম গুপ্ত।

বাপ জিজ্ঞাসা করলেন, 'কাল রাত্রে কোথায় ছিলে?'

'আমার এক সহপাঠিনীর বাড়িতে গিয়েছিলাম। ফিরতে রাত হয়েছিল।'

'সেটা আমি জানি। মেয়েটি মাঝরাতে ফোনে জিজ্ঞাসা করেছিল তুমি বাড়ি ফিরেছ কিনা। তারপর? তারপর কোথায় গিয়েছিলে?'

'কোথাও যাইনি। আমাকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। ফুটপাতে দাঁড়িয়ে ছিলাম। হঠাৎ একটা মারুতি ভ্যানে মিথ্যে কথা বলে আমাকে তুলে নেওয়া হয়।'

'তোমাকে মিথ্যে কথা বলে তুলল আর তুমি গেলে? বাচ্চা ছেলে নাকি? যদি তোমাকে দিয়ে খুন করাতো? পারতে সারাজীবন এই দায় থেকে নিজেকে বাঁচাতে? ছি ছি। তোমার আর কবে কাণ্ডজ্ঞান হবে বলতো? ওদের কাছে প্রথমে মহিমের নাম করেছ! মহিমকে তুমি চিনলে কি করে?' বাপ গলার স্বর পাল্টালেন।

'আপনার কাছে আসতে দেখেছি।'

'আমার কাছে তো হাজারটা লোক আসে। হোয়াই মহিম?'

'আমার মনে হয়েছিল উনি ক্ষমতাবান লোক।'

'মহিম তিলজলায় থাকে তা জানলে কি করে?'

'খবরের কাগজে পড়েছি।'

মহিম গুপ্ত চুপচাপ শুনছিল। এবার হাত নাড়ল, 'ঠিক আছে দাদা। আপনি

রাগ করবেন না। আমার নাম বলেছিল বলে প্রাণে বেঁচে গেছে। ওসব লোক খুব খতরনাক। তারপর আপনার ছেলে শুনে ভদ্রতা করে পৌঁছতে এসেছিল কিন্তু তখনই উনি বেইমানি করে ফেললেন বলে ওরা বলেছে। থানার বাইরে দাঁড় করিয়ে উনি ভেতরে গিয়েছিলেন পুলিশকে খবর দিতে। ঠিক তো?'

এই প্রশ্নটা আমার উদ্দেশ্যে।

'হ্যাঁ। আমি মনে করি খুনীদের শাস্তি হওয়া উচিত।'

'ঠিক কথা। কিন্তু ওরা আপনার জান বাঁচাল, বাড়িতে পৌঁছে দিচ্ছিল সেটা আপনি ভুলে গেলেন কেন? এটা কি ঠিক কাজ?'

বাপ জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমি পুলিশকে ঠিক কি বলেছ?'

'বলেছি ওরা ময়দানে একজনকে আমার সামনে গুলি করে মেরেছে। কিন্তু মেজবাবু বললেন ময়দান নাকি তাঁর এলাকায় পড়ে না। তারপর যখন উঠলেন তখন ওরা নাগালের বাইরে চলে গিয়েছে।'

'বাঃ। নাম-ধাম বলেছ? মহিমের নাম?'

'না। কিছুই বলিনি।'

মহিম গুপ্ত জিজ্ঞাসা করল, 'গাড়ির নাম্বার?'

'নাম্বার আমি নিজেই দেখিনি তো বলব কি করে?'

মহিম গুপ্তকে এবার একটু সহজ দেখাল। বলল, 'ওটা ওদের পলিটিক্যাল ব্যাপার ভাই। রোজ গ্রামে-গঞ্জে রাজনৈতিক সংঘর্ষে কত মানুষ মারা যাচ্ছে, কেউ এ নিয়ে মাথা ঘামায় না। এটা ঠিক যুদ্ধের মত। যুদ্ধে শত্রুকে মারলে তাকে খুন বলা হয় না। আপনি একটু বাড়াবাড়ি করে ফেলেছেন। তবে ওরা ভেবেছিল আপনি আমার নাম আর গাড়ির নাম্বার পুলিশকে দিয়েছেন। তা যখন দেননি, তখন ওদের বুঝিয়ে বলব মাথা ঠাণ্ডা রাখতে। এসব নিয়ে আর চিন্তা করবেন না। আপনি কতবড় লোকের ছেলে। দাদার একটা আলাদা ইজ্জত আছে। যান।'

আমি ফিরে যাচ্ছিলাম বাপ বলল, 'শোন। তোমার ওই সহপাঠিনীর নামটা কি যেন? আমার মনে পড়ছে না!'

'হেনা।'

'হ্যাঁ। হেনা আমার বড়মাসীর নাম হেনা ছিল। যাক গে, মেয়েটিকে বেশ বুদ্ধিমতী মনে হল। কোথায় আছে, মানে কি করে?'

'চাকরি করে।'

'কোথায়?'

'আমি জানি না। মনে হয় কোন বড় কোম্পানিতে।'

'সহপাঠিনীর বাড়িতে মাঝরাত পর্যন্ত আড্ডা মারো, অথচ সে কি করে তার খোঁজ রাখো না। ওয়ার্থলেস। মেয়েটি আমাকে বলেছে সে-ও চায় তুমি ব্যবসায় ঢোকো। আর সেটা করতে গেলে এন. আর. আই-দের অফারটা নেওয়া উচিত। একথা সে বলেছে। বুঝলাম তোমার মত বাতাস খেয়ে বেঁচে থাকার মেয়ে সে নয়। একদিন আসতে বলবে, ওর সঙ্গে কথা বলে আমার ভাল লেগেছে।' বাপ ইশারা করলেন চলে যেতে।

'সেটা সম্ভব নয়।' না বলে পারলাম না।

'কেন?' তিনি তাকালেন।

'আমার সঙ্গে ওর কোন সম্পর্ক নেই। ইনফ্যাক্ট একবছর ধরে নেই। কাল সেটা আরও স্পষ্ট হয়ে গেল। আমাকে ওর উদ্ভট বলে মনে হয়।'

'সত্যি? একথা বলেছে সে? ঠিক কথা বলেছে। তোমার মত উদ্ভট লোকের সঙ্গে কোন ভদ্রলোক সম্পর্ক রাখতে পারে না। মেয়েদের ওপর শ্রদ্ধা আমার আরও বেড়ে গেল। শোন, ওসব পাগলামি ছাড়ো। রোমে থাকতে হলে রোমান হওয়া উচিত।'

'তার মানে আপনার কাছে ওই আলমারির বইগুলো মিথ্যে?'

'না। কখনই না। আমার মা চণ্ডীপাঠ করতেন, গীতা পড়তেন। কিন্তু তাই বলে সংসার করতে তাঁর কখনও অসুবিধে হয়নি। যাও।'

বেরিয়ে এলাম। পাড়ার চায়ের দোকানে ঢুকে চা বলে কাগজটার একটা পাতা তুলে নিলাম। এই ব্যাখ্যা বেশ লাগসই। চণ্ডীপাঠ, গীতাপাঠ করলেই যেমন সন্ন্যাসী হয়ে যায় না কেউ তেমনই কার্ল মার্কস, লেনিন পড়লেই সেই আমলের কম্যুনিস্ট হতে হবে তার কোন মানে নেই। গীতা পড়েও যেমন লোক সংসারের প্যাঁচ পরজারে অভ্যস্ত থাকে, তেমনি ক্যাপিটাল পড়েও পরিবর্তিত পরিস্থিতির সঙ্গে মানিয়ে নেওয়া উচিত।

চা খেতে খেতে খবরের কাগজের একটা খবরে চোখ আটকালো। মন্ত্রীর সঙ্গে তার সেক্রেটারির বিরোধ লেগেছে আলুর দাম বাঁধা নিয়ে। সেক্রেটারি পরিষ্কার বলেছেন মন্ত্রী দুর্নীতির কারণেই আলুর দাম বাড়ছে এবং জনসাধারণ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন। এত স্পষ্ট কথা বলা সত্ত্বেও সেই মন্ত্রীর বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে না। বছর পাঁচেক আগে হলে এরকম খবর পেলে খুব চিঠি দিতাম। আমি এখনও মনে করি আমাদের মত সাধারণ মানুষের মত প্রকাশের একমাত্র মাধ্যম

হল খবরের কাগজ। খবরের কাগজ সেটা যদি কোন বিশেষ রাজনৈতিক দলের মুখপাত্র না হয় তাহলে সেখানে মানুষ স্বাধীন মতামত প্রকাশ করতে পারে। দশটা চিঠির একটা ছাপা হয়েছে। কিন্তু কোন কাজ হয়নি। যার উদ্দেশ্যে চিঠি তিনি গ্রাহ্য করেননি। আমি শেষবার যে চিঠি লিখেছিলাম তাতে প্রশ্ন তুলেছিলাম গত আঠারো বছরে পার্টি ক্ষমতায় আসার আগে উঁচু মাঝারি এবং নিচু তলার নেতাদের সম্পত্তির পরিমাণ কি ছিল এবং এখন কি হয়েছে তার একটা পরিসংখ্যান নেওয়া হোক। যদি কেউ ঠিকঠাক আয়ের উৎস না দেখাতে পারেন তাহলে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিক পার্টি।

কিন্তু সেই চিঠি ছাপা হলেও কোন কাজ হয়নি। আমার চিঠি তো সামান্য, লক্ষ্য করেছি, আজ যা খবরের কাগজের হেডলাইন, খবর হিসেবে দারুণ চাঞ্চল্য তুলল, পরশু সেটা লোকে ভুলে যাচ্ছে, খবরের কাগজও নতুন খবরে উৎসাহী। সরকারও জেনে গিয়েছে কোনমতে দিন সাতেক কাটিয়ে দিতে পারলেই সমস্যাটা নিয়ে কেউ আর মাথা ঘামাবে না। মনে পড়ছে দেবশ্রী রায়চৌধুরীর কথা। মেয়েটি যখন উধাও হয়ে গেল প্রতিটি খবরের কাগজে তাকে নিয়ে কত লেখালেখি। যে করেই হোক মেয়েটিকে খুঁজে বের করতেই হবে। শেষপর্যন্ত সে তার প্রেমিকের সঙ্গে ধরা পড়ল। কিন্তু পুলিশের অসাবধানতায় তারা পালিয়ে গেল ট্রেন থেকে। আর তাদের খোঁজ পাওয়া গেল না। দেবশ্রীর বাবা হন্যে হয়ে মেয়েকে খুঁজে শেষ পর্যন্ত হাওড়ার এক হোটেলে খুন হয়ে গেলেন। সেই দেবশ্রী আজও নিখোঁজ। আর কোন খবরের কাগজে ওকে নিয়ে কোন লেখা বের হয় না। কেউ ওর খোঁজে এখন সময় দিচ্ছে বলে জানা নেই।

চা শেষ করে একটা টাকা দিয়ে সোজা কলেজ স্ট্রিটে চলে এলাম। তখন সবে অফিস খুলছে। নিজের টেবিলে যাওয়া মাত্র বেয়ারা বলল প্রকাশক আমাকে ডাকছেন। গেলাম। ভদ্রলোক একটা ক্লাসিক ধরিয়ে বললেন, 'শোন, আজ থেকে তোমাকে আর প্রুফ দেখতে হবে না।'

'কেন'? আর একটা খারাপ খবর শোনার জন্যে তৈরি হলাম।

'সুভদ্রার কাছে তোমার কথা সব শুনলাম। তুমি যে আমার এখানে আটশো টাকার বিনিময়ে প্রুফ দ্যাখো একথাটা ওকে বলতে পারিনি। অতএব যা আমি বলতে পারিনি তা তোমাকে করতে দিতে পারি না। অন্তত আমার এখানে। বুঝতে পেরেছ?' প্রকাশক জিজ্ঞাসা করলেন।

'পরিষ্কার।' নির্লিপ্ত হবার চেষ্টা করলাম।

'কিন্তু তুমি এডিটিং-এর কাজটা করতে পার।'

'এডিটিং না বলে রিরাইটিং বলুন। অন্যের হয়ে লিখে দিতে হবে। না। আমি ভেবে দেখলাম এরকম কাজ আমার দ্বারা হবে না।'

'এমন ভাব দেখাচ্ছ যে তুমি স্বচ্ছন্দে পাতার পর পাতা চমৎকার উপন্যাস লিখে ফেলবে, আর পাঠকরা সেটা স্বজনের উপন্যাস ভেবে লুফে নেবে?'

'সেই ঝুঁকি তো আপনি নিচ্ছেনই। আচ্ছা, তাহলে চলি।'

'বসো। তুমি এমন নীতিবাগীশ কেন হে?'

'কি করব বলুন। হয়ে গেছি।'

'আচ্ছা ধরো, তোমার খুব প্রিয়জনের মারাত্মক এ্যাকসিডেন্ট হয়েছে। এখন রক্ত দরকার। অথচ তার গ্রুপের রক্ত কোথাও পাওয়া যাচ্ছে না। এই সময় দালাল এসে প্রস্তাব দিল বেশি টাকা দিলে সে যোগাড় করে দিতে পারে। যেহেতু তখনই রক্ত না দিলে তোমার প্রিয়জন বাঁচবে না তুমি কি করবে? তাকে মেরে ফেলবে তোমার নীতির জন্যে?' প্রশ্নটি করে প্রকাশক আমার দিকে স্থির চোখে তাকালেন।

'আপনি একটা অস্বাভাবিক পরিস্থিতির কথা বলছেন।'

'না। ওই এ্যাকসিডেন্টের পেশেন্ট আর সাধারণ মানুষের বেঁচে থাকার সমস্যার মধ্যে পার্থক্য খুবই কম। এখন যা অবস্থা বেঁচে থাকা মানেই যুদ্ধ করা। আর এই যুদ্ধে ন্যায়নীতি নিয়ে যত কম মাথা ঘামাবে তত তুমি সুবিধে পাবে।'

'আপনি কি বলতে চাইছেন? উপন্যাসটা রিরাইট করা উচিত?'

'তুমি যেতে পার।'

বেরিয়ে এসে নিজের চেয়ারে বসলাম। কিছুক্ষণ পরে এটাকে আর নিজের চেয়ার বলে ভাবতে পারব না। এইসময় ম্যানেজার ভদ্রলোক আমার সামনে এলেন, 'ভাই বিপ্লব। অত্যন্ত বিপদে পড়েছি। আমাকে সাহায্য করতে পার?'

ওঁর দিকে তাকালাম। এইরকম কথা কখনও ওঁর মুখে শুনিনি।

'তোমার বউদি এ্যানিমিক, শরীরে রক্ত কম। চিকিৎসা চলছিল। ক'দিন আগে জানতে পারলাম ব্লাড ক্যানসার। বাঁচিয়ে রাখার জন্যে প্রচুর টাকা দরকার। আমার মত গরীব মানুষের পক্ষে যা করা সম্ভব তা করছি। কিন্তু আরও টাকা দরকার।' ভদ্রলোক করুণ গলায় বললেন।

'সর্বনাশ। কিন্তু ওঁনাকে বাঁচাতে তো হবে। অফিস থেকে টাকা চেয়েছেন?'

'হ্যাঁ। স্যারকে বলেছি। শুনেই উনি কুড়ি হাজার টাকা দিয়েছেন। বিনা সুদে এরকম ধার কেউ দেবে না। এত টাকা আমি রিটায়ার করলেও পাব না। উনি

বলেছেন, আগে স্ত্রীকে বাঁচান, টাকা শোধ করার কথা পরে ভাববেন। উনি আমার কাছে দেবতা। কিন্তু আরও দশহাজার দরকার। ওঁর কাছে চাইতে সঙ্কোচ হচ্ছে। তুমি যদি টাকাটা যোগাড় করে দাও, তাহলে চিরকৃতজ্ঞ থাকব ভাই।'

'দশ হাজার টাকা?'

'হ্যাঁ। ডাক্তার তাই বলেছেন। আমার অবস্থা দেখে খুব কম করে বলেছেন।'

আমার মাথায় ঢুকছিল না কিছু। দশ হাজার টাকা দেবার ক্ষমতা আমার নেই। অথচ ওই টাকা না দিলে ভদ্রলোকের স্ত্রীকে বাঁচানো মুশকিল হবে। আমি এম. এ. পাশ করা এক আদর্শবান মানুষ অথচ দশ হাজার টাকা সঞ্চয়ে নেই, যোগাড় করে দেবার ক্ষমতা নেই।

'বিপ্লব।'

ভদ্রলোকের দিকে তাকালাম। কি বলি? নিজেকে খুব ছোট মনে হচ্ছিল। যদি মানুষের উপকারে না আসতে পারি তাহলে বেঁচে থাকার মানে কি?

'তোমার ওপর খুব ভরসা করে আছি। একটু দ্যাখো ভাই।'

'দেখছি।'

উনি নিজের জায়গায় চলে যেতেই কয়েকটা ভাবনা ভেবে ফেললাম। বাপকে বললে হয়তো টাকা পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু কি কারণে নিচ্ছি জানলে তিনি দেবেন না। যে টাকা ফেরত পাওয়া যাবে বলে মনে হয় না, সেই টাকা উনি বের করবেন না। আর যদি বা দেন অনেক শর্ত আরোপ করবেন। ভদ্রলোকের স্ত্রীকে বাঁচাবার জন্যে না হয় আমার সব আদর্শ এক্ষেত্রে ভুলে থাকলাম। দ্বিতীয় ব্যক্তির কথা মনে করতে চাইলাম যে ধার দিতে পারে। অবশ্য ধার নিয়ে কবে শোধ করব সেটা আমিই জানি না। সঙ্গে সঙ্গে হেনার মুখ মনে পড়ল। হেনা ইচ্ছে করলে দিতে পারে। কখনও ওর কাছে আমি একটা টাকাও চাইনি। হেনা কি আমাকে শর্ত দেবে? একটু ভাবলাম। তারপর সোজা প্রকাশকের ঘরে চলে গেলাম। ভদ্রলোক কিছু লিখছিলেন, অবাক হয়ে তাকালেন।

'ঠিক আছে, কাজটা আমি করব।'

'গুড। সুমতি হয়েছে বলে ধন্যবাদ।'

'কিন্তু তার জন্যে আমাকে অ্যাডভান্স দিতে হবে।'

'অ্যাডভান্স? কাজটা কেমন হল না দেখে কি টাকা দেওয়া যায়?'

'সেটা আপনার সমস্যা। কিন্তু আমার অ্যাডভান্স চাই।'

'হুম্। কত?'

'দশ হাজার।'

'পাগল নাকি। চল্লিশ টাকা দামের বই একটা এডিসন হলে লেখকই অত টাকা পাবে না। কি বলছ ভেবে বল। তোমাকে একটা কমিশন দেব ঠিকই সেটা কি দাঁড়াবে তা বিক্রির ওপর নির্ভর করছে।' প্রকাশক সরাসরি বলে দিলেন।

'কিন্তু ওঁর বই তো বছরে অন্তত পাঁচটা এডিসন হয়।'

ভদ্রলোক আমার দিকে তাকালেন, 'হঠাৎ টাকার দরকার পড়ল কেন।'

কারণটা বলতে গিয়ে সামলে নিলাম। ওটা বললে নিজের দর বাড়ানো হবে। আমি যে কত মহৎ, মানুষের উপকারি করি, এটা বলতে ভাল লাগবে না। তাছাড়া ওই ম্যানেজারবাবুকেও জড়ানো হবে। আমি যা করি না, সেই মিথ্যে কথাই বললাম, 'আমার দরকার আছে।'

'ঠিক আছে। দিচ্ছি। কিন্তু দশ দিনের মধ্যে পুরো পাণ্ডুলিপি চাই।' প্রকাশক চেক বই খুলে লিখতে লাগলেন। বললাম, 'এ্যাকাউন্ট পেয়ি করবেন না।'

'মামার বাড়ি নাকি? অডিটার কি আমার মামা?'

'টাকাটা আজই দরকার।'

'উঃ।' ভদ্রলোক চেকটা আমার দিকে এগিয়ে দিলেন। না, আমার কথা রেখেছেন উনি। ঘর থেকে বেরিয়ে এসে সোজা ম্যানেজারবাবুর সামনে গিয়ে চেকটা রাখলাম, 'এটা ক্যাশ করে নেবেন। আপনাকে তো ব্যাঙ্কে যেতেই হয়।'

চেক দেখে ওঁর চোখ বড় হল, 'সে কি? স্যারের চেক? উনি—উনি!'

'ওঁকে আপনার কথা আমি কিছুই বলিনি। টাকা যে আপনার দরকার তা ওঁকে কেন বলতে যাব? এখন চেষ্টা করুন, যাতে আপনার স্ত্রী সুস্থ হয়ে ওঠেন।' আমি সরে এলাম। টেবিলে বসেও দেখলাম ভদ্রলোক এক দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে আছেন।

উপন্যাসের পাণ্ডুলিপি বের করলাম। এখন আমি কাজটা করতে বাধ্য। যে কাজের জন্যে টাকা নিয়েছি সেটা নেবার আগে মনে হয়েছিল খুব সহজসাধ্য। এখন কি রকম ভয় করতে লাগল। যদি খারাপ হয়। যদি আমার কলম ছোঁয়ানোর কারণে এই বই তেমন বিক্রি না হয়?

প্রথম পাতাটা আবার পড়লাম। এবার মনে হল ভুলটুল যাই থাকুক না কেন প্রত্যেক লেখকের যেমন নিজস্ব কিছু বৈশিষ্ট্য থাকে স্বজনবাবুরও কিছু আছে। মাঝে মাঝেই আবেগের টোকা দিতে তিনি খুবই পটু। প্রথমবার লিখতে গিয়ে বুঝতে পারলাম কোন লেখা পড়ে সমালোচনা করা অথবা সহজেই লেখা যায়

বলে মনে হওয়া এক জিনিস আর সেটা কাগজে কলমে লেখা আর এক জিনিস। দেখে দেখে লিখছি। শুধু মাঝে মাঝে বাক্য পাল্টাচ্ছি কিন্তু তাতেই প্রচুর সময় বেরিয়ে যাচ্ছে। এইভাবে চললে দশ দিন কেন দশ মাসেও কাজটা করা যাবে না।

বিকেলবেলায় বের হলাম। সারাদিনে বুঝে গিয়েছি একমাত্র বানান ঠিক করা আর ছোটখাটো শব্দ জোড়া ছাড়া আমার পক্ষে কিছু করা সম্ভব নয়। প্রত্যেকটা জিনিসের সাফল্যের পেছনে অনুশীলন করা প্রয়োজন, যে কখনও সাইকেল চালায়নি তাকে সাইকেল দিয়ে চালাতে বললে সে কিছুতেই সক্ষম হবে না। লেখার ক্ষেত্রে আরও কিছু বাড়তি ক্ষমতা দরকার। স্বজন মুখার্জি যত খারাপই লিখুন না কেন সেটার পেছনে তাঁর দীর্ঘদিনের অধ্যবসায় রয়েছে, যা অস্বীকার করার উপায় নেই।

অতএব হার স্বীকার করতেই হবে। আর তা করলে দশ হাজার টাকা ফেরত দিতে হবে। কিন্তু আমি দশ হাজার টাকা কোথায় পাব? বাবার কাছে যাওয়ার বদলে।

হেনার ফ্ল্যাটের সামনে এসে যখন দাঁড়ালাম তখন সাতটা বেজে গিয়েছে। বেল টিপলাম। দরজা খুলল না। হেনা কি তাহলে এখন ফেরেনি? দ্বিতীয়বার একটু ধরে রাখলাম বোতামটা।

ঝট করে দরজা খুলে গেল। মাথায় তোয়ালে মোড়া, পরনে হাউসকোট, মুখে পৃথিবীর সমস্ত বিরক্তি নিয়ে হেনা দাঁড়িয়ে আছে।

'কি ব্যাপার? আবার?'

প্রশ্ন দুটো এমনভাবে করল সে যে আমার মনে হল ফিরে যাওয়া উচিত।

'প্রয়োজন আছে।'

'কি প্রয়োজন? কেন তুমি এভাবে আমাকে বিরক্ত করতে আসো?'

'আমি আর বিরক্ত করব না।'

'কিসে মানুষ বিরক্ত হয় সে জ্ঞান তোমার আছে?' সরে দাঁড়াল সে, 'যা বলবার তাড়াতাড়ি বল। আমাকে আবার বেরুতে হবে।'

ঘরে ঢুকলাম। দরজা বন্ধ করে সে তোয়ালে খুলে চুল মুছতে লাগল। বুঝতে পারলাম এতক্ষণ বাথরুমে ছিল। ওর কানের পাশের চুলে এখনও জল লেগে আছে। জলের ফোঁটা মুক্তোর মত ঝুলছে। আলো পড়ায় সেটাকে আরও রহস্যময় মনে হচ্ছিল। হঠাৎ আমি তীব্র আকর্ষণ বোধ করতে লাগলাম। ওই জলের

ফোঁটাকে স্পর্শ করতে খুব ইচ্ছে হল। হেনাকে এখন কী দারুণ টাটকা লাগছে, এই রাগ বা বিরক্তি ওই শরীরের সঙ্গে মানাচ্ছে না।

আমি মন্ত্রমুগ্ধের মত হেনার দিকে এগোলাম।

হেনা খুব অবাক হয়ে শুধু বলতে পারল, 'আরে!'

কিন্তু আমি ততক্ষণে সেই মুক্তোর ফোঁটা ছুঁয়ে ফেলেছি। ছোঁয়ামাত্র আমার আঙ্গুল ভিজে গেল। মুক্তো নেই? হেনা চট করে ঘাড় ঘুরিয়ে দেখতে চাইল আমি কি করছি। ওর গালে আঙ্গুল লাগতেই শরীরে বিদ্যুৎ বয়ে গেল। আমি দু'হাতে ওকে জড়িয়ে ধরে কাছে টানলাম। হেনার শরীর প্রতিবাদ করতেই ওর ঠোঁটে ঠোঁট চেপে ধরলাম।

চুম্বনের স্বাদ কিরকম হয় আমার জানা ছিল না। ওই মুহূর্তে স্বাদের কথা চিন্তাও করতে পারলাম না। আসলে কোন চিন্তা করার মত মাথার অবস্থা আমার ছিল না। হেনার ঠোঁটে ঠোঁট চেপে আমি পৃথিবীটাই ভুলে গেলাম। আমি তখন অসাড়। আর সেই মুহূর্তে সাড়া দিল হেনা। ওর জিভের ডগায় এক নতুন পৃথিবীর দরজা খুলে গেল। হেনার হাতের বাঁধন আরও শক্ত হল। শেষপর্যন্ত ও মুখ নামিয়ে আমার বুকে মাথা রাখল। আমরা স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম কিছুক্ষণ।

হঠাৎ এক পা সরে দাঁড়িয়ে এক রাশ বিস্ময় মুখে নিয়ে হেনা জিজ্ঞাসা করল, 'একি হল? আমি কি স্বপ্ন দেখছি? তুমি বিপ্লব তো?'

আমি নিঃশ্বাস ফেললাম। হাসবার চেষ্টা করলাম।

'তোমার মাথা ঠিক আছে তো?' ঘাড় কাত করল হেনা।

'তোমাকে এখন দারুণ দেখাচ্ছে।' কোন রকমে বলতে পারলাম আমি।

'কিন্তু এ তুমি কি করলে?'

'আমি—আমি।' কথা খুঁজে পাচ্ছিলাম না।

'এতদিন আসছ, মনে হত ভাল হয়তো বাসো, কিন্তু কখনও সীমা ছাড়াওনি। মনে মনে তোমাকে আমি আর পাঁচটা মানুষের থেকে আলাদা বলে ভাবতাম। কিন্তু একি করলে?'

আমি চুপচাপ দাঁড়িয়েছিলাম। তখনও আমার নিঃশ্বাস স্বাভাবিক নয়, সমস্ত মনে এক লক্ষ অশ্বারোহীর দৌড়ে যাওয়ার চাপ।

'তুমি কি জানো আজ পর্যন্ত কেউ আমাকে চুমু খায়নি?'

'জানি।'

'জানো? কি করে?'

'ব্যাখ্যা করতে পারব না।'

'আচ্ছা। নিজের কাছে প্রতিজ্ঞা ছিল যে আমার স্বামী হবে শুধু তাকেই এই অধিকার দেব। কিন্তু তুমি শেষ পর্যন্ত জোর করে প্রতিজ্ঞা ভাঙলে?'

'প্রতিজ্ঞা ভাঙতে হবে কেন?'

'কেন? কি ভেবেছ তুমি। আজ সাত-আট বছর ধরে তুমি যাওয়া আসা করেছ। আমাকে স্বপ্ন দেখিয়েছ, কিন্তু কখনও স্পর্শ করোনি।

ক্রমশ আমার মনে হয়েছিল তুমি সাধারণ সহজ নও। কিন্তু আমি তো মেয়ে। আমি সব সময় চাইব যে আমার প্রেমিক হবে আমার স্বামী হবে সে সহজ থাকবে। তার ওপর ওই আদর্শের বাসি ভূত যা আজকেব যুগে অচল, তা তোমার ঘাড়ে এমন ভাবে জেঁকে বসেছে যে আমার পক্ষে মানিয়ে নেওয়া অসম্ভব। আমার অপছন্দ তুমি জানো। তা সত্ত্বেও তুমি আজ জোর করে এই কাণ্ড করলে। তারপরও বলছ, প্রতিজ্ঞা ভাঙতে হবে কেন?'

'আমাকে বিয়ে করতে তোমার আপত্তি আছে?'

'অবশ্যই। এই তোমাকে বিয়ে আমি কখনই করতে পারি না। আত্মহত্যা করার শখ আমার নেই।'

'আত্মহত্যা?'

'নয়তো কি? স্বামীর দায়িত্ব তুমি নিতে পারবে?'

'চেষ্টা করব!'

'কিভাবে? ক'টা টাকা রোজগার কর তুমি? তোমার ওই আদর্শ বাধ্য করবে তোমাকে আধপেটা খেয়ে থাকতে। ঝুপড়িতে থাকা মানুষের শান্তিটুকুও আমি পাব না। অথচ তুমি শিক্ষিত, রবীন্দ্রনাথ থেকে সেক্সপীয়র পড়া মানুষ। কিন্তু কতটুকু তোমার দাম?'

'কিন্তু আমি যদি বাবার প্রস্তাব অ্যাকসেপ্ট করি?'

'তার মানে?'

'ওই এন.আর.আই-দের সঙ্গে ব্যবসায় নামি?'

'তুমি কি আমার সঙ্গে রসিকতা করছ?'

'একদম না। আমি সিরিয়াস।'

'তোমার বাবার সুপারিশ নিতে লজ্জা করবে না?'

'করবে। কিন্তু আজ আমার অন্য উপলব্ধি হয়েছে।'

'কি রকম?'

'একজন পরিচিত মানুষ তাঁর স্ত্রীকে বাঁচাবার জন্যে আমার কাছে দশ হাজার টাকা চেয়েছিলেন। আমি প্রথমে ভেবেই পাইনি কি করে দেব? সামান্য দশ হাজার টাকা। শেষে যে প্রকাশনা সংস্থায় প্রুফ দেখি তার মালিকের কাছে টাকাটা চাইলাম। তিনি আগে আমাকে প্রস্তাব দিয়েছিলেন একটি পাণ্ডুলিপিকে রিরাইট করে দিলে কিছু কমিশন দেবেন। বইটার কোথাও আমার নাম ছাপা হবে না। আমি প্রথমে রাজি হইনি। পুরো ব্যাপারটা শুধু বেআইনি নয়, অনৈতিকও। কিন্তু দশ হাজার টাকা আগাম নিয়ে শেষপর্যন্ত সম্মতি দিতে বাধ্য হলাম। অথচ কাজটা করতে গিয়ে দেখলাম আমি পারছি না। আদর্শের দোহাই দিয়ে সরে দাঁড়ানো এক কথা আর কাজে নেমে নিজের অক্ষমতা আবিষ্কার করা অন্য কথা। শেষেরটা বেশি যন্ত্রণাদায়ক। আর কাজটা না করতে পারলে দশ হাজার টাকা শোধ করব কি করে তাও বুঝতে পারছি না। আমি আর কিছুর সঙ্গেই তাল রাখতে পারছি না হেনা।'

'অদ্ভুত তো। একজন পরিচিত লোক দশ হাজার চাইল আর তুমি ধার করে সেটা দিয়ে দিলে? ভদ্রলোক ফেরত দেবেন কবে?'

'আমি জানি না। জিজ্ঞাসা করিনি। কারণ উনি উত্তরটা দিতে পারতেন না।'

'চমৎকার। কিন্তু লিখতে গিয়ে যেমন আবিষ্কার করলে লেখাটা তোমার পক্ষে সহজ ব্যাপার নয় তেমনি ঘটনাটা তো ব্যবসার ক্ষেত্রেও ঘটতে পারে!'

'তার মানে?'

'তুমি জীবনে কখনও ব্যবসা করোনি? এন.আর.আই-রা যে ব্যবসা করতে চাইছেন তার সম্পর্কে কোন ধারণাই তোমার নেই। তুমি কি করে ভাবছ দুম করে সেই ব্যবসায় নেমে রাতারাতি সফল হবে? কোন ট্রেনিং বা অভিজ্ঞতা ছাড়াই সাফল্য আসবে? একি ছেলের হাতের মোয়া? আমি কি বলছি বুঝতে পারছ?'

হেনা কাছে চলে এল।

'পারছি। কিন্তু তা হলে কোনদিনই কিছু করা সম্ভব নয়। হেনা আমি তোমার সাহায্য চাই।'

'কিরকম'?

'আমাকে মানসিক শক্তি দাও।'

'ওটা কেউ কাউকে দিতে পারে না। নিজেকে অর্জন করতে হয়।' হেনা ঘুরে দেওয়াল-ঘড়ি দেখল, 'ইস। কী দেরি হয়ে গেল। আমি যে—!'

'যেতেই হবে?'

'মানে?'

'না গেলেই নয়। বসো না। তোমার সঙ্গে গল্প করি।'

হেনার মুখের চেহারা বদলে গেল। এরকম লাজুক মুখ কখনও দেখিনি আমি। আমি ওর হাত স্পর্শ করলাম। হেনা মুখ ফেরাল, 'বসো। আমি কিছু খাবার তৈরি করি। নিশ্চয়ই অনেকক্ষণ খাওনি তুমি।' সে হাত ছাড়িয়ে ছুটে গেল ভেতরে।

কিরকম সহজ হয়ে গেল পৃথিবীটা। আমার চারপাশের ঘনিষ্ঠ মানুষজন চাইছে তাদের কাছে যেটা স্বাভাবিক সেই ব্যবহারটা আমি করি। আমি যদি কেরানিগিরি করি তাহলে ঘুম থেকে উঠে কেরাসিনের লাইনে না দাঁড়িয়ে দু'নম্বরী করে কেরোসিন নিয়ে আসি বাড়তি ক্যানে। বাজারে গিয়ে চোটপাট করে দাম কমাই। বাড়ি ফিরে এসে ছেলেমেয়েকে পড়াতে বসে বিদ্যাসাগর নেতাজীর আদর্শের কথা বলি। ট্রামে, বাসে এর ওর পা মাড়িয়ে সম্ভব হলে কন্ডাক্টারকে ফাঁকি দিয়ে অফিসে যাই এগারটা নাগাদ। লেট কেন হল এই প্রশ্নের জবাবে চিৎকার করে বড়বাবুর পিলে চমকে দিই, আগে ট্রান্সপোর্ট ব্যবস্থা ঠিক করতে বলুন সরকারকে তারপর ঠিক সময়ে এ্যাটেনডেন্স চাইবেন? তারপর খবরের কাগজ বা পার্টির মুখপত্র খুলে বসি টেবিলে। সেকসনের অন্যদের কাজকর্ম সম্পর্কে খোঁজ নিই। টিফিনের সময় দলের সঙ্গে ঘরে-ঘরে ঘুরে ইউনিয়নের ইস্যুগুলো প্রচার করি। বিকেলে মিছিলে যাওয়ার আগে সেকসন থেকে দিনের প্রাপ্য উপরির অংশটুকু নিতে যেন না ভুলি। কালো হাত গুঁড়িয়ে দাও বলতে বলতে একসময় মিছিল থেকে সটকে পড়ে বাড়ি ফিরে বউ-এর শাড়ির ভাঁজে উপরির টাকা গুঁজে রাখি। তারপর ছেলেমেয়েদের গল্প শোনাই কিভাবে হাসতে হাসতে ক্ষুদিরাম দেশের জন্যে ফাঁসিতে ঝুলেছিলেন। কিন্তু সেইসঙ্গে এও বলতে হবে আগে পড়াশুনা শেষ করে ভাল চাকরি যাতে পাও, সেই চেষ্টা করো।

আর যদি কেরানি না হয়ে ওপরতলার চাকুরে অথবা বড় ব্যবসায়ী হই তাহলে জীবন অন্য খাতে বইয়ে দেবার নামই স্বাভাবিক হওয়া। সকালে উঠে চা খেয়ে টয়লেটে ঢোকা। স্নান শেষ করে ব্রেকফাস্ট খেয়ে স্ত্রীকে আদর করে গাড়িতে উঠে বসতে হবে, যেটা আমাকে অফিসে পৌঁছে দেবে ন'টার মধ্যে। সেখানে সারাদিন নানান সমস্যার সমাধান করে এম. ডি-কে তুষ্ট করা আমার কর্তব্য হবে। এর মধ্যে কনফারেন্স আর মিটিং, লাঞ্চের সময় ধান্দাবাজি এসব তো আছেই। অফিসের পর বাড়ি ফিরেই বউকে নিয়ে পার্টিতে যেতে হবে। নিজের বউকে অন্য লোকের সঙ্গে গল্প করার সুযোগ দিয়ে অন্যের বউ-এর সঙ্গে ফস্টিনস্টি করতে

করতে মদ গিলতে হবে পাঁচ-সাত পেগ। তারপর স্খলিত পায়ে বাড়ি ফিরে বিছানায় লুটিয়ে পড়ার নাম জীবনযাপন, সহজ এবং স্বাভাবিক।

হ্যাঁ। আমাকেও স্রোতে ভাসতে হবে। স্রোতের উল্টোদিকে সাঁতার কাটলে বেশিক্ষণ ভেসে থাকা যে যায় না, তা এতদিনে টের পেয়েছি। আমি যেমন হেনাকে হারাতে চাই না, তেমনি নিজের কাছেও হারতে চাই না। রাত দশটা নাগাদ হেনার ফ্ল্যাট থেকে বেরিয়ে এসে ফুটপাতে দাঁড়িয়ে এইসব কথা ভাবছিলাম। একটু আগে হেনা বাপকে ফোন করেছিল। বাপ না বলে এখন আমার বাবা বলা উচিত। সব শুনে তিনি খুব খুশি হয়েছেন। হেনাকে নাকি বাড়িতে যেতে বলেছেন। বলেছেন, 'তোমার জন্যে মা আমি বুড়ো বয়সে শান্তি পেলাম।' হেনা আপ্লুত।

ঠিক সেইসময় মারুতি ভ্যানটা পাশে এসে দাঁড়াল। গাড়ির সামনের দরজা খুলে লোকটি নামল, 'এই যে স্যার! চেনা যাচ্ছে?'

চিনলাম। মাথা নাড়লাম, 'হ্যাঁ।' সেইসঙ্গে ভয় ভয় করতে লাগল।

'কাল দু'নম্বরী করলেন কেন? আমাদের ফাঁসাতে চেয়েছিলেন?'

'দুর.।' আমি হেসে উঠলাম, 'ওটা ভরকি! মহিম গুপ্ত কিছু বলেনি? আমি তো তোমাদের বিরুদ্ধে পুলিশকে একটা কথাও বলিনি। গাড়ির নাম্বার দিইনি। দিয়েছি?'

'তা দেননি। কিন্তু থানায় ঢুকেছিলেন কেন?'

'তার আগে বলো এখানে আমি আছি সেটা কি করে জানলে?'

'আমার লোক আপনার পেছনে ছিল। শুনুন মহিম গুপ্ত বা আপনার বাবা আছেন বলে আপনাকে কিছু করিনি। কিন্তু খবর পেলাম বাইপাশের পাশে বিদেশিদের সঙ্গে কারখানা করবেন। আমার দশটা লোককে চাকরি দিতে হবে।'

'চাকরি?'

'হ্যাঁ।'

'এখনও কোন কথাই ফাইন্যাল হয়নি।'

'হবে। হয়ে যাবে। মহিমদা মিথ্যে খবর দেয় না।'

'তার চেয়ে এক কাজ করো।' আমি হাসলাম। ছেলেটি তাকাল।

'গাড়ির ডিকিতে কেউ আছে না কি হাত-পা বাঁধা অবস্থায়? ময়দানে নিয়ে চল, কাল যা পারিনি, আজ সেটা করে দিচ্ছি।'

'রসিকতা করছেন?'

'না। চাকরি দেওয়ার চেয়ে কাউকে গুলি করে মারা অনেক সহজ।'

'আচ্ছা দু'নম্বরী লোক তো আপনি।' সে গাড়িতে ফিরে যেতেই ওটা হুস করে

বেরিয়ে গেল। এত সহজে ছাড়া পাব ভাবতে পারিনি। আজ সকালেও এই কথাগুলো বলতে পারতাম না। বেঁচে থাকার জন্যে যে বর্মের দরকার হয় তা আমার হাতে এসে গেছে।

একটা ট্যাক্সি ডাকলাম। পেছনের সিটে বসে গন্তব্য বলে দিলাম। অনেক অনেক বছর পরে নিজের পয়সায় ট্যাক্সিতে চড়লাম। আধঘণ্টার মধ্যে বাড়িতে পৌঁছে জিজ্ঞাসা করলাম, 'কত হয়েছে?'

'তিরিশ টাকা দিন স্যার, ঊনত্রিশ হয়েছে।'

'আপনার মিটার খারাপ।'

'না স্যার।'

'আমি বলছি খারাপ। চলুন, থানায় চলুন।'

'থানায় নিয়ে যাবেন কেন স্যার। আমি এই গাড়ি তো চালাই না, আজ সন্ধেবেলায় বের করেছি। মিটার খারাপ থাকলে মাপ করে দেবেন।'

'কিন্তু সন্ধে থেকেই আপনি লোক ঠকাচ্ছেন। তাছাড়া একথাটাও মিথ্যে হতে পারে। পুলিশ ঠিক বের করবে কবে থেকে ট্যাক্সিটা চালাচ্ছেন।'

'আপনার কাছে হাত জোড় করছি স্যার, অন্যায় হয়ে গেছে। আর হবে না।'

'তাহলে কত দিতে হবে?'

'কিছু না। কিছু দিতে হবে না স্যার।' আমি নেমে দাঁড়াতেই দ্রুত বেরিয়ে গেল ট্যাক্সিটা। কয়েক মুহূর্ত হতভম্ব ছিলাম। তারপরই মনে হল, বাঃ। কি সুন্দর ব্যবস্থা। আন্দাজে ঢিল ছুঁড়তেই ভাড়া দিতে হল না। এইটে আগে কখনও মাথায় আসতো না।

দরজার সামনে দু'জন দাঁড়িয়ে আমাকে দেখে ফিসফিস করছিল। একজন এগিয়ে এল, 'দাদা, আপনার বাবার সঙ্গে দরকার ছিল। জরুরি।'

'হবে না। বাবা এখন আহ্নিক করছেন। কাল সকালে আসুন।'

'কাল! তখন তো খুব ভিড় হয়। পার্টির লোকজন দেখা করতে দেয় না।'

'আমার সঙ্গে দেখা করবেন। ব্যবস্থা করে দেব।'

'ঠিক আছে। আপনি যা বলবেন তাই হবে।'

'ও কে। কাল দেখা হবে।'

অনেক দিন পরে, বোধহয় জ্ঞান হবার পর এই প্রথম মধ্যরাত্রে বাড়ির সদর দরজার কলিং বেলের বোতাম টিপলাম আমি। এখন যে কোন চরিত্রে চমৎকার অভিনয় করতে পারব, বাজি রেখে দেখুন।

হয়তো পরের পূর্ণিমায়

আকাশের দিকে মুখ তুলে দেখছিল সে। রাগী মোষের মত তেড়ে আসছে মেঘগুলো। অতবড় আকাশটার দখল নিতে তীব্রগতিতে ছুটে যাচ্ছে চারপাশে। বড় মেঘের সঙ্গে ছোট মেঘগুলো যেন জুড়ে যাচ্ছে চটপট। মোষের কথা মনে হলেও মেঘগুলো মোষের চেয়েও কালো এবং ভয়ঙ্কর। অথচ দেখতে দেখতে মুগ্ধ হয়ে যাচ্ছিল সে। তার কেবলই মনে হচ্ছিল সে যদি ওই মোষেদের শক্তি পেত! পৃথিবীর কোনও মানুষের ওই শক্তি নেই।

মাঠের মাঝখানে দাঁড়িয়ে ঈর্ষা করতে করতে সে এমনই বিহ্বল যে, কেউ যে তাকে ডাকছে তা টের পায়নি। মেঘেদের শরীরে শক্তি আছে, মেঘ দেখলে কে না ভয় পায়! উন্মুখ হয়ে সে ভাবছিল, আহা মোষেদের শক্তি যদি তার মধ্যে চলে আসত! এই সময় পৃথিবী প্রায় অন্ধকার। সংঘর্ষে মেঘেদের বুক থেকে বিদ্যুৎ ছিটকে নেমে আসছে পৃথিবীতে। এই সব মিলেমিশে যে ভুবনমোহিনী রূপে আকাশ সেজেছে তা তার চোখে পড়ছিল না। সে শুধু ঈর্ষাকাতর হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

'অ্যাই সুন্দর, এত ডাকছি, কথা কানে যায় না?'

সে মুখ নামাল। জগদীশদা দাঁড়িয়ে আছে।

'তোকে ডাক্তারবাবু তখন থেকে ডাকছে। চল।' জগদীশদা হাঁটতে লাগল। ওর একটি পা বেঁকে ছোট হয়ে যাওয়ায় হাঁটতে অসুবিধে হয়। হাঁটার সময় মনে হয় এই বুঝি পড়ে গেল। সুন্দর জগদীশের পাশে চলে এল, 'আচ্ছা জগদীশদা তোমার পা ঠিক হয়ে গেলে কি রকম হয়?'

'হবে না। ডাক্তারবাবু বলেছেন, কখনও হবে না। দুটো পা সমান সমান করতে যে টাকা লাগবে তা এ জীবনে পাব না আমি।' জগদীশ দাঁড়িয়ে গেল।

'যদি হয়?'

'বামন হয়ে চাঁদ ধরার স্বপ্ন! চল।'

'যদি আমি তোমার পা ঠিক করে দিই?' সুন্দরের বলার ভঙ্গি জগদীশকে অবাক করল। তারপরই সে হো হো করে হেসে উঠল। তার শরীর কাঁপতে লাগল। পেটে হাত দিয়ে মাটিতে বসে পড়ল হাসতে হাসতে। সুন্দর হতভম্ব হয়ে দৃশ্যটা দেখছিল। হঠাৎ মনে হল, সে কিছু না, কোন অসম্ভব কাজকে সম্ভব করার শক্তি

ভগবান তাকে দেননি। সে দৌড়তে লাগল। এই সময় ঝোড়ো বাতাস শুরু হল, শীতল ঝোড়ো বাতাস।

'কোথায় গিয়েছিল?' বিশাল চেহারা থেকে বাজখাঁই গলা ভেসে এল।

'মাঠে।' সুন্দর মাথা নামাল।

'মাঠে? এই বাদলবেলায় মাঠে কার গরু খুঁজতে গিয়েছিলি?'

'আজ্ঞে—।'

'এসব বাঁদরামো আমার এখানে চলবে না। তোকে আমি কি বলেছিলাম?'

এতক্ষণে মনে পড়ল। ডাক্তারবাবু তাকে ইসমাইলের মাংসের দোকানে যেতে বলেছিলেন। আজ রাত্রে মাংস হবে। বেমালুম ভুলে গিয়েছিল সে।

কোন কথা না বলে দ্রুত ছুটতে লাগল সে। আর সঙ্গে সঙ্গে বৃষ্টির ফোঁটা শরীরে তীরের মতো বিঁধতে লাগল। শরীরের সমস্ত শক্তি একত্রিত করে সে দৌড়াতে লাগল। যেন বৃষ্টিতে সম্পূর্ণ ভিজে যাওয়ার আগে হাটের মুখে ইসমাইলের দোকানে পৌঁছে যাবে।

এই মফস্বল শহরে মানুষ একেই কম, তারপর বৃষ্টিটিষ্টি হতে রাস্তা একদম ফাঁকা। অসময়ে একটা পাতলা অন্ধকার পৃথিবীর ওপর ঝুলছিল। একেবারে ভিজে চুপসে সুন্দর ইসমাইলের দোকানে পৌঁছে দেখল কোন পাঁঠার ঠ্যাঙ শিকে ঝুলছে না। লম্বা বিড়ি টানতে টানতে ইসমাইল বৃষ্টি দেখছিল, বলল, 'কি চাই?'

'মাংস।'

'দোকান পরিষ্কার। কাল সকালে এসো।' বলেই চোখ ছোট করল, 'তুমি ডাক্তারবাবুর কাছে আছ না? হ্যাঁ মনে পড়েছে। মুশকিল হয়ে গেল।'

'কেন?'

'ডাক্তারবাবুর পাঁঠা আজ আমার কাছে নেই। বলবে ইসমাইল ক্ষমা চেয়েছে। থাকলে এই বিকেলবেলাতেও নতুন মাল কাটতাম। ডাক্তারবাবু আমাদের ভগবান।'

তার মনে পড়ল। ডাক্তারবাবু যে সে পাঁঠার মাংস খান না। শুধু ছোলা খেয়ে বড় হতে হবে ওটাকে। গায়ের রঙ হবে মিশমিশে কালো। ধরতে গেলেই ঘাড় বেঁকিয়ে টুঁস দিতে আসবে, এমন রাগী। সেই পাঁঠার মাংস নাকি যেমন নরম তেমন সুস্বাদু। মাংস কেনার কথা হলেই ডাক্তারবাবু এইরকম বর্ণনা দেন।

বৃষ্টি মাথায় নিয়ে ফিরছিল সুন্দর। কোথায় বর্ধমানে মামাদের বাড়ি আর কোথায় বিহারের এই আধাপাহাড়ি মফস্বল শহর। আঠারো বছর বয়সেও যখন পড়াশুনা না হবার জন্যেই কাজকর্ম তেমন জুটল না তখন ঘর ছেড়েছে সে।

ঘর বলতে মামার বাড়ি। বাপ জন্ম দিয়েই মরে গিয়েছিল। বিধবা মায়ের সঙ্গে আশ্রয় পেয়েছিল মামার বাড়িতে। তারা যে আশ্রিত, মামার দাক্ষিণ্যে বেঁচে আছে একথা প্রতি পদে পদে মনে রাখতে হত। ভুলে গেলেই প্রহার। মামার শরীরের শক্তি ফুরিয়ে এলেও আঠারো বছরের শক্তিশালী ভাগ্নের গায়ে জুতো ছুঁড়ে মারতে দ্বিধা করতেন না। কারণ তিনি জানতেন জাদুকাঠি তাঁর হাতে। তখন মামাকে কংসের মতো মনে হত। আর মনে হতেই শ্রীকৃষ্ণের ভূমিকায় নিজেকে দেখতে চাইত সে। শ্রীকৃষ্ণ যখন সমস্ত অসম্ভবকে সম্ভব করেছিলেন অবহেলায় তখন সে পারবে না কেন? নিশ্চয়ই পৃথিবীর কোথাও এমন কোন মন্ত্র অথবা অমৃত লুকোন আছে যা পান করলেই অমিত শক্তির অধিকারী হওয়া যায়। মা বলেছিলেন তাকে পালিয়ে যেতে, 'এখানে পড়ে পড়ে অন্ন ধ্বংস করছিস আর মার খাচ্ছিস। তোর লজ্জাও হয় না! এত বড় শরীরটা দিয়ে কিছু কর। নিজের ভাত নিজে জুটিয়ে নে। পালা এখান থেকে। আমার জন্যে তোকে চিন্তা করতে হবে না।'

দু-চারটে জামাপ্যান্ট ঝোলায় ভরে বেরিয়ে পড়েছিল সে। বর্ধমান স্টেশন থেকে ট্রেনটা ঠিক কোন দিকে যাচ্ছে না জেনেই উঠে বসেছিল। ট্রেনটা ছিল রাতের। দেহাতি কিছু মানুষ আর কয়েকজন শহরের লোক বসেছিলেন ছড়িয়ে ছিটিয়ে। এক পাশে চুপচাপ বসেছিল সে। আর তখনই মনে হয়েছিল সে যদি ট্রেনের ড্রাইভার হত! তাহলে এই ট্রেনটা নিয়ে সে পৃথিবীর কোন অজানা প্রান্তে চলে যেত। হু হু করে ছুটে চলা ট্রেন, চাকার শব্দ, হুইসলের আওয়াজ একসঙ্গে মিলেমিশে তাকে উত্তেজিত করে তুলছিল বেশ। আলোগুলো যেন অসহায় হয়ে পেছনে ছিটকে চলে যাচ্ছে। গোটা পৃথিবীটা হেরে যাচ্ছে এই ট্রেনের বিক্রমের কাছে। আহা, সে যদি ট্রেনটাকে নিয়ন্ত্রণ করার কায়দা জানতে পারত!

টিমটিমে আলোর একটা স্টেশনে ট্রেনটার থামার কোন দরকার ছিল না। তবু থামল। এবং তখনই একজন চেকার উঠে এল। লোকটা চারপাশে তাকিয়ে তার মুখে কি দেখতে পেল কে জানে, সোজা সামনে এসে হাত পাতল, 'টিকিট?'

কামরার অল্প আলোতেও সে দেখতে পেল লোকটার হাতে কোন রেখা নেই। এটা কি করে সম্ভব? হাতের রেখা তো ভাগ্যকে নিয়ন্ত্রণ করে। দু'বছর আগে একজন জ্যোতিষী তাকে বুঝিয়েছিল সুদিন আসতে তার দেরি নেই।

'টিকিট?'

'আমি টিকিট কাটিনি।'

'টিকিট কাটোনি অথচ ট্রেনে চড়েছ? কি আস্পর্ধা। টিকিট কাটোনি কেন?'

'টাকা পয়সা নেই।'

'ক্রিমিন্যাল। ঠাণ্ডা মাথার ক্রিমিন্যাল। সামনের স্টেশনে তোমাকে নামতে হবে।'

এই সময় মোটাসোটা এক ভদ্রলোক ওপাশ থেকে বলে উঠলেন, 'এই যে, শ্রীমান, এদিকে এসো। হ্যাঁ, তোমাকে বলছি। এসো।'

বাধ্য হয়ে সুন্দর তার ঝোলা নিয়ে এগিয়ে গেল।

'কোথায় যাওয়া হবে?'

মাথা নিচু করল সে, 'জানি না।'

'জানো না! বাড়ি থেকে পালিয়েছ নাকি?'

'না থাকতে পেরে চলে এসেছি। মামা—।'

'মা আছেন?'

'হ্যাঁ। মা-ই বলল আসতে।'

'হুঁ। পড়াশুনা কদ্দুর?'

'এইট পর্যন্ত পড়েছিলাম।'

'বাঃ। একেবারে বিদ্যের হিমালয়। চাকরি করবে?'

সুন্দর ফ্যালফ্যাল চোখে তাকাল। লোকটাকে যেন সে দেখতে পাচ্ছে না।

'আমার কাছে যে ছিল তার ওপর ভরসা করতে পারতাম। এক দিনে হবে না, তবে আগ্রহ যদি থাকে তাহলে আমি শিখিয়ে নেব। এই ধরো ব্যান্ডেজ বাঁধা, ওষুধগুলো এগিয়ে দেওয়া, ডিসপেন্সারির দরজা খোলা-বন্ধ, ঝাঁট দেওয়া। এগুলো প্রথম দিকে। এর সঙ্গে আমি ইনজেকশন দেওয়াও শিখিয়ে দেব পরে। রাজি?'

সে মোলায়েম ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল।

'নিন চেকার মশাই, ওর টিকিটের দাম আমিই দিয়ে দিচ্ছি।'

চেকার এবং আরও কয়েকজন এইসব সংলাপ অবাক হয়ে শুনছিল। চেকার বলল, 'কিন্তু এটা কি ঠিক করছেন? চেনাজানা নেই একটা উটকো লোককে হুট করে চাকরি দিয়ে দিলেন। ও তো চোর ছ্যাঁচোড় হতে পারে!'

মাথা নাড়লেন ভদ্রলোক, 'হতে পারে। তবে উটকো লোকের সুবিধে হল দু'বার ভাবতে হয় না। একবারেই দুর করে দেওয়া যায়।'

বৃষ্টিতে ভিজে ভিজে শীতে কাহিল, দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে সুন্দর বলল, 'নেই।'

ডাক্তারবাবু অবাক হয়ে তাঁকে দেখলেন, 'বৃষ্টিতে ভিজতে কে বলেছে?'

'খেয়াল ছিল না।'

'এবার সর্দি হবে, জ্বর আসছে। আমাকে জ্বালানোর মতলব? এসব ছ্যাঁচড়ামি আমার এখানে চলবে না। মাংস নেই মানে?'

'আপনার মাংস নেই।'

হঠাৎ হো হো করে হাসতে লাগলো ডাক্তার, 'সত্যি কথা, চর্বিগুলো বেড়ে গিয়ে মাংস বোধহয় কমে যাচ্ছে। ঝটপট শুকনো জামাপ্যান্ট পরে আয়।'

তা এখানে মাস তিনেক হয়ে গেল। এখন সে ওষুধগুলো চিনে গিয়েছে বললে একটু মিথ্যে বলা হবে। তবে বেশির ভাগ ওষুধ সে চেনে। ব্যান্ডেজ বাঁধতে পারে। ডাক্তারবাবু সেটা নিজের হাতে শিখিয়েছেন। এক এক প্রয়োজনে আলাদা আলাদা ব্যান্ডেজ। ব্যান্ডেজ বাঁধতে সুন্দরের খুব ভাল লাগে। পরতে পরতে জড়িয়ে যায়। কোথাও বেঢপ উঁচু হয়ে থাকে না। ডিসপেন্সারির দায়িত্ব তার। রাত্রে এখানেই শোওয়া। সেটা অবশ্য আর এক জ্বালা। মাঝরাত্রে কেউ দরজায় এল, 'খুলুন, খুলুন, ছেলের এই হয়েছে, মেয়ের তাই হয়েছে।' খুলতে হয়। তারপর ভেতরের দরজায় আওয়াজ করে ডাক্তারবাবুর ঘুম ভাঙিয়ে সমস্যার সমাধান। কয়েকদিন আগে রাত গভীরে ঠিক ওইরকম ধাক্কা। যেন পেটের ছেলে পড়ে যাচ্ছে। কি ব্যাপার? না, পরিবারের সকাল থেকে পাতলা পায়খানা হচ্ছিল, এখন একেবারে জল ছিটকাচ্ছে। শোনার পর ডাক্তারবাবুকে ডাকতে গিয়ে সে থমকে দাঁড়াল। রাতের খাওয়াদাওয়ার পর লোকটা অনেকক্ষণ ধরে বই পড়েন। একবারে ঘুম আসতে চায় না। লোকটাকে ডাকতে মায়া হল। তার মনে পড়ল শরীরের ওই অবস্থায় ডাক্তারবাবু যে ওষুধ দিয়ে থাকেন তা সে জানে। বাঁ দিকের তাক থেকে দুটো বড়ি বের করে নিয়ে এসে দরজা খুলে সে আগন্তুককে দিল, 'এখনই একটা খাইয়ে দাও, পরেরটা চার ঘণ্টা পর। নুন-চিনির জল ছাড়া কিছু খাবে না। বুঝেছ?'

পরের দিন দুপুরে সেই লোকটি হাজির। ডাক্তারবাবু তখন রুগী দেখছিলেন। লোকটি বলল, 'আপনি ভগবান। দুটো বড়ি দিলেন তাতেই আমার পরিবার সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে গেল। জলের মত পায়খানা হচ্ছিল, কী বিশ্রী গন্ধ! আর হচ্ছে না। তা জিজ্ঞাসা করছি, শেষ বড়ি তো ভোরবেলায় পড়েছিল, আর কি দিতে হবে?'

'যেখান থেকে নিয়েছ সেখানে গিয়ে জিজ্ঞাসা কর।'

'ওষুধ তো আপনিই দিয়েছেন। কাল অনেক রাত্রে এসে ডাকলাম, আপনার নতুন লোক ভেতর থেকে ওষুধ এনে ছিল, এঃ, সব ভুলে গেছেন।'

ডাক্তারবাবু ডাকলেন, 'সুন্দর!'

কাজটা ঠিক হয়েছে কিনা বুঝতে পারছিল না সুন্দর। একটু অস্বস্তি নিয়ে সে সামনে গেল। ডাক্তারবাবুর গলা শান্ত কিন্তু কি রকম অচেনা, 'কি ওষুধ দিয়েছিস?'

সুন্দর বাঁ দিকের তাক থেকে ওই ধরনের বড়ি এনে দেখাল। মাথা নাড়লেন ডাক্তারবাবু, 'ঠিক আছে। আর যখন হয়নি তখন খাওয়ানোর দরকার নেই। তবে একটা কাছে রাখ। যদি দ্যাখো আবার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে তখন খাইয়ে দিও। আর হ্যাঁ, আজ কোনও সলিড খাবার নয়।'

'সে তো ঠিকই। কাল উনি যেমন বলেছিলেন তাই দিচ্ছি।'

'কি বলেছিলেন?'

'নুনচিনি জল।'

'ও। না, আজ একটু চিঁড়ে ভিজিয়ে একেবারে কাদা করে দিও।'

শেষ রুগীকে দেখে ডাক্তারবাবু আবার ডাকলেন। কাছে যেতেই প্রচণ্ড একটা চড় এসে পড়ল গালে। সুন্দরের স্বাস্থ্য ভাল। গত তিন মাসে সেটির প্রভূত উন্নতি হয়েছে। তবু ওই চড়ের আঘাত সামলাতে না পেরে অনেকটা টলে গেল। ডাক্তারবাবু চিৎকার করে উঠলেন, 'হতচ্ছাড়া বদমাস, ডাক্তার হয়েছ? ডাক্তার হবার শখ? আমাকে না জানিয়ে ওষুধ দেওয়া? ওষুধের একটু হেরফেরে মানুষের প্রাণ চলে যায় তা জানিস! অনেক কষ্ট, ধারধোর করে ডাক্তারি পড়েছি আমি। আর তুই দু'দিনের জন্যে এখানে এসে আমার ওপর দিয়ে যাচ্ছিস!'

'আপনি ঘুমাচ্ছিলেন।'

'তাতে তোর কি! নরনারায়ণের সেবা করতে এটা খুলেছি। ঘুমাচ্ছি বলে সেটা বন্ধ থাকবে নাকি? আর কক্ষনও যদি কোন ওষুধ আমার অজান্তে কাউকে দাও তাহলে আমি জেলে ঢুকিয়ে দেব। দুর হ।'

মানুষের উপকার করলে ওইরকম ব্যবহার পাবে? সুন্দরের খুব রাগ হয়ে গিয়েছিল। ডাক্তারখানা বন্ধ হবার পর সে স্নান-খাওয়া করতে গেল না। এখন প্রায় পড়ন্ত দুপুর। চারধার খাঁ খাঁ করছে। ডাক্তারখানার সামনে একটা বড় বটগাছের নীচে বসেছিল সে। ডাক্তারবাবু যখন তাকে মারল তখন সে পাল্টা আঘাত করতে পারত। তার শরীরেও যে শক্তি আছে তা বুঝিয়ে দিতে পারত। কিন্তু কথাটা সেসময় মাথায় আসেনি। এখন আসতে খারাপ লাগত। ডাক্তারবাবু আর যাই হোক মামার মতো নয়। লোকটার মধ্যে ভালবাসা আছে এটা সে টের পায়। ডাক্তারবাবুকে পাল্টা মারার কথা মনে এসেছে বলে এখন খারাপ লাগল।

কিন্তু কথাটা ঠিক, ডাক্তারবাবু অন্যায় করেছে। ওইভাবে মারা ঠিক হয়নি। সে তো ভাল কাজই করতে চেয়েছিল। কিন্তু তা তো হল, সে যদি খুব কষ্ট করে ডাক্তার হতে পারত! পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ডাক্তার। যার ওষুধে যে কোনও অসুখ সেরে যাবে। ডাক্তারবাবু ভাল কিন্তু অনেকের অসুখ সারাতে পারেনি। চারজন মানুষকে সে জানে যারা এই তিন মাসে শুধু ওষুধ খেয়ে যাচ্ছে, কোনও উপকার হয়নি। ডাক্তারবাবুকে লোকে ভগবান বলে কিন্তু ওঁর ওষুধ খেয়েও তো বাজারের এক দোকানদার মরে গেল। তবে? সে যদি ডাক্তার হত তাহলে পৃথিবীর কেউ মারা যেত না, এমন কি মামার যে অসুখটা এখন বাড়ছে সেটাও সারিয়ে দিত। কিন্তু কি করলে সেরকম ডাক্তার হওয়া যায়?

গত দু-তিন বছরে সে কম চেষ্টা করেনি। পঞ্জিকার বিজ্ঞাপন দেখে কোনওমতে দশ টাকা জোগাড় করে পাঠিয়ে দিয়েছিল। এক্সট্রা স্ট্রং মাদুলি এসেছিল। সেটা পরে মনে হয়েছিল পৃথিবীতে তার চেয়ে শক্তিশালী আর কেউ নেই। মামাতো ভাই খবরটা ফাঁস করে দিতে মামা তাকে বেধড়ক পিটিয়েছিল টাকা নষ্ট করার জন্যে। মাদুলিটা কোন কাজেই লাগেনি। বর্ধমান শ্মশানের কাছে একজন সাধুগোছের লোক এসেছিল। এক বন্ধুর সঙ্গে সে গিয়েছিল লোকটার কাছে। তার প্রার্থনা শুনে লোকটা দু'লাইন মন্ত্র শিখিয়ে দিয়েছিল। দিনে এক হাজার বার ওই মন্ত্র জপ করলে কাজ হবে। তারপর যার দিকে তাকাবে সে-ই বশীভূত হবে। ঠিক একহাজার বার জপ করার পর সে একটা ষাঁড়ের দিকে তাকিয়েছিল। ষাঁড়টা হঠাৎ তেড়ে এল তার দিকে। সে বড় চোখে তাকিয়েও যখন ওটাকে বশীভূত করতে পারল না তখন প্রাণ বাঁচাতে পালাতে বাধ্য হয়েছিল। আগেকার কাল হলে সে সাধনায় বসত। গায়ে উঁইপোকার ঢিবি গজিয়ে গেলেও আসন ছেড়ে নড়ত না। যখন তার সাধনায় সন্তুষ্ট হয়ে মহাদেব বর দিতে আসতেন তখন টুক করে সেটা চেয়ে নিত। কিন্তু এখনকার কালে কেউ সাধনা করে না। মহা মুশকিল।

জগদীশ এল, 'ডাক্তারবাবু ডাকছেন।'

'কেন?'

'তোর জন্যে সবাই বসে থাকবে নাকি? নাওয়া খাওয়া করবি না?'

'আমার ভাল লাগছে না।'

'সেটা তুই নিজের মুখে বলে আয়।' জগদীশ ফিরে গেল খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে। রান্নাঘরের বারান্দায় আসন পেতে ডাক্তারবাবু খেতে বসেছিলেন। এইভাবেই

খাওয়া ওঁর অভ্যেস। এই মফস্বল শহরে ওঁর খাওয়া নিয়ে লোকে গল্প করে। আমের সময় সব খাওয়ার পর কুড়িখানা আম খেয়ে নেন। এক কেজি মাংস একাই শেষ করে ফেলতে পারেন। অথচ এসবের জন্যে ওঁর শরীর কখনও খারাপ হয় না।

উঠোনে দাঁড়িয়ে সুন্দর দেখলো ডাক্তারবাবু মাছের মুড়ো খাচ্ছেন। এত বড় মুড়ো এর আগে কারও পাতে দ্যাখেনি সে। তাকে দেখলেন ডাক্তারবাবু। সমুদ্র শুষে নেবার মতো মুড়োর ঘিলু শুষে বললেন, 'ইডিয়ট। আমার ওপর রাগ করে তুই নিজের পেটকে কষ্ট দিচ্ছিস? তোকে চড় মেরেছি কারণ শাস্তিটা তোর প্রাপ্য ছিল। তাই বলে না খেয়ে কাকে কষ্ট দিচ্ছিস? যা স্নান করে নে, আজ রান্নাটা জব্বর হয়েছে। পেট পুরে খেয়ে ফ্যাল।'

অনেক কথা মাথায় এসেছিল কিন্তু বলতে পারা গেল না।

সেই বিকেলে ডিসপেন্সারি খোলার আগে ডাক্তারবাবু তাকে ডাকলেন, 'হ্যাঁ রে, আমার মনে হচ্ছে তোর আর এখানে থাকতে ভাল লাগছে না। তাই তো?'

সুন্দর জবাব দিল না। চট করে কিছু বলা ঠিক নয়।

'তোর মুখ-চোখ দেখে তাই মনে হচ্ছে। তা বাবা, মতলবটা খুলে বল।'

'আমার এইভাবে থাকতে ভাল লাগে না।'

'কিভাবে?'

'আমি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মানুষ হতে চাই।' বলার সময় আচমকা মুখ উজ্জ্বল হয়ে গেল।

'শ্রেষ্ঠ মানুষ? বাঃ। খুব ভাল। স্বপ্ন দেখতে হলে বড়সড় দেখাই ভাল। তা কিরকম শ্রেষ্ঠ মানুষ? মিস্টার ইউনিভার্স? পৃথিবীর সেরা শরীর?'

সুন্দর এক ঝলক ভেবে নিয়ে মাথা নাড়ল, 'অনেকটা।'

'অনেকটা আবার কি রে? বল, পুরোটা। শোন, সবার সেরা তো এমনি এমনি হওয়া যায় না। তোকে তার জন্যে পরিশ্রম করতে হবে। সকাল বিকেল কারও কোচিং-এ কঠোর অনুশীলন করতে হবে। তা মিস্টার ইউনিভার্স হবার জন্যে যে বয়স থেকে ওটা করতে হয় সেটা তুই প্রায় পেরিয়ে এসেছিস। তবু চেষ্টা কর। কলকাতায় গিয়ে মনোতোষ রায় মশাই-এর কাছে ভর্তি হ। আমি চিঠি দিয়ে দিচ্ছি। কিন্তু মনে রাখিস এটা খেলা নয়, কঠোর পরিশ্রম এবং সাধনা। আর এসব করেও শেষপর্যন্ত যে তুই মিস্টার ইউনিভার্স হবি এমন কোন গ্যারান্টি নেই। নইলে রানার্স আপ পদটা থাকবে কেন? তাকেও তো একই সাধনা করতে হয়।'

'তারপর?'

'তারপর? পুলিশে চাকরি করবি। নাহলে অন্যদের ব্যায়াম শেখাবি। তারপর শরীর বুড়িয়ে গেলে বলবি আমি এক সময় মিস্টার ইউনিভার্স হয়েছিলাম। ব্যাস।'

'না। আমি ওরকম হতে চাই না।'

'অ। কিরকম চাও?'

'আমি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মানুষ হব। যা চাইব তাই করতে পারব।'

'তাহলে তোমাকে নীল গাইয়ের দুধ খেতে হবে।' ডাক্তারবাবু খুক খুক করে হাসলেন।

'নীল গাইয়ের দুধ?'

'হুঁ। সেটা এমনি খেলে চলবে না। বাঁটে মুখ লাগিয়ে খেতে হবে। আর খাওয়ার সময়টা ঠিক রাত দুপুরে জোৎস্না ফুটলে। পারবি?'

'পারব। কিন্তু নীলগাই কি জিনিস?'

'গরু। তবে আমাদের চারপাশের পোষা গরুদের মতো নয়। তারা জঙ্গলে পাহাড়ে ঘুরে বেড়ায় দলবেঁধে। জোৎস্না রাতে তাদের শরীর থেকে অদ্ভুত নীলচে আভা বের হয়। স্বপ্ন আর জাগরণ একাকার হয়ে যায়। মাকে টাকা পাঠিয়েছিস?'

'অ্যাঁ?'

'এ মাসে মাইনে পেয়ে মাকে টাকা পাঠিয়েছিস?'

'হ্যাঁ।'

'বাঃ। আমি বলি কি, প্রতি রাত্রে স্বপ্নে নীলগাই দেখার চেষ্টা কর। যতদিন পর্যন্ত সেটা না দেখবে ততদিন এখানেই কাজ করো। সামনের সপ্তাহে আমি ইনজেকশন দেওয়া শিখিয়ে দেব। যাঃ।'

রাত্রে ঘুম আসছিল না। চোখের সামনে শুধু নীলগাই তার বাঁটভর্তি দুধ নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ডাক্তারবাবুর গোয়ালে যে সাদা গরুটা দুধ দেয় তাকে দেখে এসেছে। বাঁটে মুখ দিতে গেলে ও লাথি মারতে চাইবে বটে তবে শ্রেষ্ঠ পুরুষ হবার জন্যে ওরকম লাথি খাওয়া যায়।

পর পর তিনটে রাত সে ঘুমাল অথচ স্বপ্ন দেখল না। স্বপ্নই যখন দেখা হল না তখন নীলগাই অনেক দূরে থেকে গেল। হঠাৎ তার মনে হল, যদি সে কোনওদিন স্বপ্ন না দ্যাখে তাহলে তো ভয়ঙ্কর ব্যাপার হয়ে যাবে। সে জগদীশকে একা পেয়ে প্রশ্ন করল। জগদীশ মাথা নাড়ল, 'নীলগাই? তারা তো এখানে থাকে না।'

'কোথায় থাকে?'

'তুই বরং হারান মাস্টারকে জিজ্ঞাসা কর। ও ঠিক ঠিকানা বলে দেবে।'

অগত্যা হারান মাস্টারের শরণাপন্ন হল সুন্দর। হারান মাস্টার মাথা নাড়ল, 'তারা থাকে পাহাড় আর সমতলের মাঝখানে। বেশি উঁচুতে নয় আবার নিচুতেও নামে না। তবে সেই পাহাড়ের বুকে যদি নদী থাকে আর শীতকালে তার জল শুকিয়ে যায় তাহলে নীলগাইয়ের দল সেই নদীর চরে ঘুরে বেড়াতে খুব ভালবাসে।'

'কিন্তু জায়গাটা কোথায়?'

'ভূমধ্যসাগরীর দ্বীপপুঞ্জে, আফ্রিকার উত্তর ভাগে, ব্রাজিলে এবং কিছু কিছু দেখা যায় অস্ট্রেলিয়াতেও। ম্যাপ দেখবে?'

'আমাদের এখানে পাওয়া যায় না?'

'নিশ্চয়ই যাবে। যাবে না কেন?'

'পাহাড় কোনখানে? কোন ট্রেন সেখানে যায়? স্টেশনে গিয়ে খবরটা পেতেই আর কিছু মনে রইল না। পকেটে কিছু নেই, পুটলিটা ডিসপেন্সারির কোনায়, কিন্তু কী এক ঘোরের মধ্যে সে ট্রেনে উঠে বসল। জানলা দিয়ে তাকিয়ে থাকতে থাকতে চোখ যখন টনটন করছে তখনই দিগন্তে পাহাড়ের রেখা দেখা গেল। ধীরে ধীরে আরও স্পষ্ট হচ্ছিল পাহাড়। ছোট স্টেশনে ট্রেন থামছে, হাঁপাচ্ছে, আর সুন্দরের মনে হচ্ছিল কতক্ষণে ছাড়বে। পাশের লোকটাকে সে জিজ্ঞাসা করল, 'ওই পাহাড়ে ট্রেনটা কতক্ষণে পৌঁছবে?'

'পাহাড়ে তো ট্রেন যায় না। পাহাড়ের পাশ কাটিয়ে চলে যাবে।'

'সে কি।' সুন্দর হুড়মুড়িয়ে নেমে পড়ল।

আজ তার দিকে কোন কালো কোট পরা মানুষ হাত বাড়াল না। ট্রেন চলে গেলে সে হাঁটা শুরু করল। আধঘণ্টা হাঁটতেই সে পাহাড়ের নিচে। পাথুরে হলেও পাহাড়ের গায়ে গাছপালা আছে। শেষ দেহাতি লোকটাকে সে জিজ্ঞাসা করল, 'আচ্ছা, এই পাহাড়ে কি নীলগাই আছে?'

'জানি না বাবু। তবে অনেক কিছু আছে।'

'নদী আছে? নদীর চর?'

'নাঃ। তবে খুব বড় দীঘি আছে একটা।'

পাহাড়ের বুকে দীঘি? সুন্দরের মনে হল নদীর চরে যদি নীলগাই বেড়াতে আসতে পারে তাহলে দীঘির ধারে আসবে না কেন? সে হাঁটতে লাগল। পাহাড়ে

চড়ার অভ্যেস না থাকলেও সে দ্রুত উঠছিল। ক্রমশ লোকালয় হারিয়ে গেল। পাখির ডাক আর বাঁদরের চিৎকার ছাড়া কোন শব্দ নেই। দুপুর পার হয়ে গেছে অনেকক্ষণ। খিদে তেষ্টায় শরীরের শক্তি ক্রমশ উধাও হয়ে যাচ্ছিল। সে নিজেকে বোঝাচ্ছিল, এসবই তার পরীক্ষা। সাধনার পথে এভাবেই পরীক্ষা দিতে হয়।

হঠাৎ তার খেয়াল হল। এখন কি চাঁদ ওঠার রাত? গতরাতেও বৃষ্টি হয়েছিল। তার আগে? জ্যোৎস্না দেখেছে বলে মনে হয় না। অথচ চাঁদের রাত হওয়া দরকার। এই বনপাহাড়ে নীলগাই যদি থাকে তাহলে সে অপেক্ষা করবে চাঁদের জন্যে। কথাটা যদি আগে মাথায় আসত তাহলে সময় বুঝে আসা যেত।

এতটা পথ পাহাড়ে জঙ্গলে হেঁটে এল কিন্তু কোনও প্রাণীর দেখা সে পায়নি। এই জঙ্গল কি প্রাণীশূন্য? বাঁদর আছে, মানে গাছে ফল আছে। কিন্তু বড়সড় জন্তুরা থাকবে এমন কথা নেই। সে ক্লান্ত পায়ে হাঁটতে হাঁটতে বিলের ধারে একটা পাথরে ঠেস দিতেই প্রশ্নটা ভেসে এল, 'অ্যাই? কে তুই?'

চমকে পেছনে তাকাতেই সে অবাক হয়ে গেল। একজন মহিলা দাঁড়িয়ে আছে। মাথার চুলে জটা পাকিয়ে চুড়ো হয়ে আছেন। পরনে আলখাল্লা, হাতে একটা ত্রিশূল। কপালে মস্ত সিঁদুরের টিপ। মহিলার চোখ দুটো খুব বড় এবং জ্বলছে। সে ভয় পেয়ে গেল। বর্ধমানের শ্মশানে একজন ভৈরব তাঁর ভৈরবীকে নিয়ে ক'দিনের জন্যে এসেছিল। সেই ভৈরবী এমন ভয়ঙ্কর সুন্দরী ছিল না। হ্যাঁ, সুন্দরী তো বটেই। গায়ের রঙ ফরসার দিকে, শরীর টানটান এবং লম্বা। ডান হাতে একটা পুটুলি।

'কে তুই?' আবার গর্জন ভেসে এল।

'আমি সুন্দর।' সে মিনমিনে গলায় বলল।

'সু-ন্দ-র!' বলেই খিলখিলিয়ে হেসে উঠলেন ভৈরবী। তারপরই গম্ভীর হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'মতলব কি? এখানে এসেছিস কেন?'

'কেন? এখানে আসা কি বারণ?'

'হ্যাঁ বারণ। এ তল্লাটের সব্বাই জানে। মড়া পোড়ানো, ছাড়া কেউ এদিকে পা বাড়ায় না। মতলববাজদের পেট ফুঁড়ে দিই আমি। আমাকে চিনিস?'

'আজ্ঞে না। আমি বর্ধমানে থাকি।'

'বর্ধমান! সে তো অনেক দূর। এখানে কেন?'

সুন্দর বুঝল তার পরিত্রাণ নেই। তারপরই খেয়াল হল। এই ভৈরবী যদি এখানে থাকেন তাহলে নিশ্চয়ই জানেন নীলগাই এই পাহাড়ে আছে কিনা, সে

হাত জোড় করলেন, 'আমি কোন অন্যায় করতে আসিনি। আপনি বলতে পারেন, এই পাহাড়ে নীলগাই আছে কিনা। আমার খুব দরকার।'

'নীলগাই? কিসের দরকার।'

'একটা সাধনা আছে।'

'সাধনা? ফক্কিবাজী! মিথ্যে বললে দেব তোর জিভ খসিয়ে।'

'আমি নীলগাইয়ের বাঁট থেকে দুধ খেতে চাই।'

'অ্যাঁ? কেন?'

'সেটা বলা নিষেধ।'

'তিন কুলে কেউ আছে?'

'না। কেউ নেই।'

'এখানে থাকা হয় কোথায়?'

'এখনও থাকিনি। ট্রেন থেকে নেমে হেঁটে এসে পড়েছি।'

'ট্রেন। সে তো অনেক দূর।'

'আজ্ঞে নীলগাই কি আছে?'

ভৈরবী তার ত্রিশূল আর পুটুলি পাথরের উপর রাখলেন। চোখ বন্ধ করে কিছু বিড় বিড় করে হাঁকালেন, 'অ্যাই লব, অ্যাই কুশ।' সঙ্গে সঙ্গে দুটো প্রমাণ সাইজের হনুমান ঝুপ ঝুপ করে কোথা থেকে পাথরের ওপর এসে পড়ল। ভৈরবী বললেন, 'এরা খুব রাগী। যেখানে দাঁড়িয়ে আছিস সেখানেই থাকবি। নড়বি না। আমি স্নান করে আসি।' বলেই আলখাল্লা সমেত জলে নেমে গেলেন। গুনে গুনে আটবার ডুব দিলেন ভৈরবী। তাঁর জটা পাকানো চুলে জল ঢুকল কিনা বোঝা গেল না। তারপর কোমর জলে উঠে এসে ফট করে আলখাল্লাখানা খুলে ফেললেন এদিকে পেছন ফিরে। তাঁর নগ্ন পিঠ কোমর হাত-মুখের চেয়ে ঢের ফরসা। জলের ওপর আছাড় মেরে আলখাল্লা কাচলেন তিনি। তারপর সোজা উঠে এলেন ওপরে। মুখে মন্ত্র। চিৎকার করে বলা শব্দগুলো যেন তাঁকে আড়াল করে রাখছিল। এক পলক তাকিয়েই চোখ সরিয়ে নিল সুন্দর। জীবনে প্রথমবার সে একজন নগ্নিকাকে দেখল। কিন্তু নারীদেহের সম্পদ তাকে বিন্দুমাত্র আলোড়িত করল না।

'সঙের মতো দাঁড়িয়ে না থেকে যা জিজ্ঞাসা করছি তার উত্তর দাও।'

মুখ ফেরালো সুন্দর। শুকনো আলখাল্লাটা নিশ্চয়ই পুটলিতে ছিল। সেটি এখন অঙ্গ ঢেকেছে। ভেজাটা পুটলিতে নিয়ে ত্রিশূল হাতে ভৈরবী এখন দাঁড়িয়ে।

'কেন এসেছিস?'

'নীলগাইয়ের দুধ খাবো বলে এসেছি।'

'নীলগাইয়ের দুধ?'

'হ্যাঁ। জ্যোৎস্না রাতে নীলগাইয়ের দুধ খেলে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মানুষ হওয়া যায়।'

'নীলগাইয়ের দুধ কে এনে দেবে তোকে?'

'আনা দুধ খেলে হবে না। বাঁটে মুখ লাগিয়ে খেতে হবে।'

ভৈরবী তার পা থেকে মাথা পর্যন্ত দেখলেন, 'পেটে কিছু পড়েছে?'

'না।'

'আয় আমার সঙ্গে। পেছন পেছন আসবি। বেশি কাছাকাছি এলে লবকুশ তোকে ছিঁড়ে ফেলবে। ভীষণ শয়তান এ দুটো।' ভৈরবী হাঁটতে শুরু করলেন।

পাথর ডিঙিয়ে ডিঙিয়ে পাহাড়ে চড়তে শুরু করল সে ভৈরবীকে অনুসরণ করে। ওদের মাঝখানে হনুমান দুটো রাশভারী মেজাজে হাঁটছে। একটা মাঝেমাঝেই পেছন ফিরে তার দিকে তাকিয়ে দাঁত দেখাচ্ছে। কিছুক্ষণ যাওয়ার পর একটা চাতাল গোছের জায়গায় উঠে এল ওরা। চাতালের এক পাশে ছোট্ট বাখারির ঘর যার মাথায় টিন দিয়ে ছাদ তৈরি। ভৈরবী সেখানে গিয়ে প্রণাম করল। সুন্দর দেখল ঘরের মধ্যে কালীমূর্তি রয়েছে। ছোট্ট কিন্তু ভয়ঙ্করী। এই মায়ের পায়ের তলায় শিব নেই, হাতে খড়্গ। যেন যুদ্ধে মত্ত তিনি। ভৈরবী বললেন, 'মাকে প্রণাম কর।'

সে আদেশ মান্য করল। তারপর চারপাশে নজর ফেলতেই বেশ কয়েকটা জায়গায় পোড়া ছাই দেখতে পেল। কাঠে আগুন দিলে এমন ছাই হয়।

ভৈরবী হাসলেন, 'কি দেখছিস? ওগুলো চিতা। গ্রামের লোক মড়া নিয়ে এসে এখানে পোড়ায়। মায়ের সামনে। সব শালা স্বর্গে যাবে। হুঁ'! আমাকে যে ভৈরব এখানে এনেছিল, সে-ই নিয়মটা চালু করেছিল। চিতায় আগুন দেওয়ার পর সবাইকে নেমে যেতে হত এখান থেকে। সেই সময় ভৈরব মড়ার মাথা চিতা থেকে বের করে ঘিলু খেত। তারপর পুরো ছাই হয়ে গেলে লোকজনদের ডেকে অস্থি দিয়ে দিত। ভৈরব মরে যাওয়ার পর আমি আত্মীয়স্বজনদের চিতার কাছে থাকার অনুমতি দিয়েছি। ওসব ঘিলু ফিলু খাওয়ার কথা ভাবলেই গা গোলায় আমার। আয়।'

চাতালের এক পাশে পাথরের সিঁড়ি। সেটা দিয়ে ওপরে উঠতেই গুহা দেখতে পেল সুন্দর। ভৈরবী বললেন, 'এখানে কোন পুরুষের ওঠা নিষেধ। ভৈরব মারা যাওয়ার পর শুধু তোকেই নিয়ে এলাম। ওখানে জল ধরা আছে। হাতমুখ ধুয়ে

নে, আমি দেখি তোকে কি দিতে পারি।' ভৈরবী গুহার মধ্যে ঢুকে গেলেন।

একটা বড় ড্রামে জল রয়েছে। তাই দিয়ে মুখ হাত পা ধুতে শরীর একটু জুড়ালো। সুন্দর ঘুরে দাঁড়িয়ে মুগ্ধ হয়ে গেল। অনেকটা ওপরে বলে বিল স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। এমন কি বিলের ধারের গাছগাছালিও। চোখ জুড়িয়ে যায়। তার পরই খেয়াল হল, ভৈরবীর সঙ্গে এখানে চলে আসাটা কি ভাল হল? ওরা অনেক মন্ত্রতন্ত্র জানে। তাকে যদি বশ করে ফেলে! কামাখ্যা বলে একটা জায়গায় নাকি মানুষকে ছাগল বানিয়ে দেয় মন্ত্র পড়ে। সে হনুমান দুটোকে খুঁজল। নিচের চাতালে বসে একজন আর একজনের শরীর থেকে পোকা বাছছে। ওরা মানুষ নয় তো, মন্ত্র পড়ায় হনুমান হয়ে গেছে! কিরকম ছমছম করতে লাগল শরীর।

'আয়। এদিকে আয়।' ভৈরবীর গলা ভেসে এল।

একটা কলাইয়ের থালা ভর্তি ভাত আর কিছু সেদ্ধ। এক পাশে নুন। ভৈরবী নিজেও তাই নিয়েছে। ভৈরবী বললেন, 'আমি এই খাই, খেতে হয় খা, নইলে রেখে দে।'

'মাছ মাংস খাওয়া হয় না?'

'ও আবার কি ধরনের কথা! হয় না? হয় তুমি বলবি, নয় আপনি। আমি তোর চেয়ে বয়সে ঢের বড়। তিরিশ হয়ে গেল, এর মধ্যে তিন তিনটে ভৈরব পার করেছি।' খেতে খেতে ভৈরবী বলছিলেন, 'তা অস্বীকার করব না, তিনজনের কাছে অনেক কিছু শিখেছি। মাছ মাংস! মড়ার মাংস খেতে হয়েছে আমাকে, শুধু ঘিলুটা পারিনি। তুই যদি খেতে চাস তাহলে বিল থেকে মাছ ধরে আন, জঙ্গলে খরগোস, বনমুরগী আছে, ধরে নিয়ে এলে নুন হলুদ দিয়ে ফুটিয়ে দেব। কিন্তু আমি নিরামিষ খাই।'

'আমি ধরে আনব?'

'তোকে তো দিন দশেক এখানে থাকতেই হবে।' তারপর চাঁদ উঠবে। হ্যাঁ, নীলগাই এখানে আছে। দল বেঁধে বের হয়। তদ্দিন তো পেটে দিতে হবে।'

এতক্ষণে স্বস্তি হল। এই বিস্বাদ খাবারও ভাল লাগল। সে জিজ্ঞাসা করল, 'এখানে একা থাকতে তোমার ভয় লাগে না?'

'দুর! ভয় করব কাকে? উল্টে লোকেরাই আমাকে ভয় পায়। এর পর রাত্রে খেতে হবে নাকি? আমি বাপু রাঁধতে পারব না। আমার রাতের ভাত তোকে দিয়ে দিলাম। দুটো পেয়ারা আছে, খিদে পেলে খেয়ে নিস।'

খাওয়ার পর ভৈরবী ভেতরে চলে গেলেন। শরীরটা এখন শান্ত। সে বিলের

দিকে তাকিয়ে বসেছিল। ছায়া ঘন হয়েছে। একটু পরেই আঁধার নামবে। হঠাৎ নাকে কটু গন্ধ লাগল। বাতাসে ভেসে আসছে। গন্ধটা কিসের? সে উঠল। চারপাশে নাক টেনে বুঝল ওটা আসছে গুহার ভেতর থেকেই। গুহার মুখে দাঁড়িয়ে দেখল ভৈরবী বাবু হয়ে বসে দু'হাতে কল্কে ধরে টান দিচ্ছেন। গাঁজা খাচ্ছেন ভৈরবী। তাকে দেখামাত্র হেসে ইশারা করলেন কল্কে দেখিয়ে। সে দ্রুত মাথা নেড়ে না বলল।

সঙ্গে সঙ্গে চোখ বড় হয়ে গেল আরও। গুহা থেকে বেরিয়ে এসে ভৈরবী কড়া গলায় বললেন, 'তিনটে টান দে। এখানে থাকতে হলে আমি যা যা খাব তাই তোকে খেতে হবে।' তারপর হালকা হাসলেন, 'কোন ক্ষতি হবে না। বরং মন হালকা হবে। শরীরে বল পাবি। খা।'

কাঁপা হাতে কল্কে নিল সুন্দর। ভয়ে ভয়ে একটা টান দিতেই কাশি এল। ভৈরবী বললেন, 'গলায় কাঁটা সরছে। দে টান, জোরে জোরে।'

তিনটে টানেই অবস্থা কাহিল। কোনওমতে কল্কেটা ফিরিয়ে দিয়ে সে এক পাশে বসে পড়ল। মাথা ঘুরছে, নাকি পৃথিবীটা! চোখ খুলে রাখতে পারছিল না সে।

'তোকে নীলগাই এমনি এমনি বাঁটে মুখ রাখতে দেবে? তার জন্যে অনেক কিছু শিখতে হবে। আমার কথা শুনে চললে সেসব আমি শিখিয়ে দেব। এখন শুয়ে পড়।'

এত ঘুম সে কোনওদিন ঘুমায়নি। চোখ মেলতেই কানে শব্দ আসতে লাগল। মন্ত্র পড়ার শব্দ। এখনও আকাশে পাতলা অন্ধকার। ভোর হব হব। সে মাথা তুলে চারপাশে তাকাল। তারপর উঠে এগোতেই নিচের চাতালে নজর গেল। মায়ের মন্দিরের সামনে কাঠের আগুন জ্বেলে বসে আছেন ভৈরবী। বসার ভঙ্গিটায় শরীর আরও টানটান দেখাচ্ছে।

ও পাশে কিছু লোক নিভে আসা চিতাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে। ভৈরবী মন্ত্র পড়ে চলেছেন। শ্মশানযাত্রীদের কেউ চিতায় জল ঢাললে শব্দ হল আগুন নেবার। এবং তখনই মন্ত্রপাঠ শেষ হল।

ভৈরবী বললেন, 'যাঃ। ওর আত্মা আর এখানে থাকবে না। অস্থি নিয়ে তোরা বিদায় হ এবার। আগুন নিবিয়ে অস্থি সংগ্রহ করে লোকজন নেমে গেল। রাতেও

কখনও কোনওসময় মড়া নিয়ে লোকজন এসেছিল, ভৈরবী নেমে গিয়েছিল, তা সে টের পায়নি? অদ্ভুত ঘুম হল তার।

সুন্দর নীচে নেমে আসতেই ভৈরবী বললেন, 'কি খবর? মশাইয়ের ঘুম ভাঙল! এখন এই বস্তাটা ওপরে নিয়ে যাও। চাল ডাল আলু পেঁয়াজ নুন যা আছে তাতে আমার এক-দেড় মাস স্বচ্ছন্দে চলে যেত। এখন তো মুখ বেড়েছে তাই মা আগেভাগে পাইয়ে দিল।'

সুন্দর বস্তাটা তুলল। বেশ ভারী।

সারাটা সকাল ভৈরবী পড়ে পড়ে ঘুমাল। এর মধ্যে সুন্দর জঙ্গলের অনেকটা ঘুরে এসেছে। বনমুরগী আর খরগোশ চোখে পড়লেও ধরার চেষ্টা করেনি। কিন্তু আচমকা তার চোখ পড়ল জঙ্গুলে কলাগাছের দিকে। বাঁদরদের নজর এড়িয়ে কি করে কলাগুলো অত পুরুষ্টু হয়ে রয়েছে, ভগবান জানে! সে টেনে হিঁচড়েও কলার কাঁদি ছিঁড়তে পারছিল না। এইসময় হুপ হুপ শব্দ হল। সুন্দর দেখল কয়েকটা হনুমান গাছের ডাল থেকে লাফিয়ে লাফিয়ে নেমে আসছে। সে দৌড়াল। এদের সঙ্গে লড়াই করার কোনও অস্ত্র তার কাছে নেই।

কিছুদুর আসার পর খুব আফসোস হল। সে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মানুষ হতে চায় অথচ কয়েকটা হনুমানকে শায়েস্তা করার ক্ষমতা তার নেই। নিজেকে ধিক্কার দিচ্ছিল সে। গুহায় ফেরার অনেকক্ষণ বাদে ভৈরবীর ঘুম ভাঙল। বাইরে বেরিয়ে এসে ওপরে হাত তুলে যখন আলস্য ভাঙছেন ভৈরবী তখন হঠাৎ বুকের মধ্যে কি যেন নড়ে উঠল সুন্দরের। ভৈরবীর ঊর্ধ্বাঙ্গে অনেক স্থির-ঢেউ।

'কি রে? মন খারাপ করে আছিস কেন?'

সে শুকনো গলায় বলল, 'আমাকে মন্ত্র শিখিয়ে দেবে?'

'মন্ত্র? কিসের মন্ত্র?'

'মানুষ, প্রাণীকে বশ করার মন্ত্র?'

'দুর শালা! তোর আর এখানে থাকার দরকার নেই। যা, বিদায় হ।'

'কেন? আমি কি অন্যায় বললাম?'

'তোর কোনও যোগ্যতা আছে মন্ত্র নেবার?' ভৈরবী চিৎকার করলেন।

'তুমি যদি শিখিয়ে দাও!'

ভৈরবী এবার অদ্ভুত চোখে তাকাল। চোখ সরিয়ে নিল সুন্দর। ওররকম অদ্ভুত চাহনির সামনে সে কখনও দাঁড়ায়নি। প্রায় মিনিট দুয়েক বাদে ভৈরবী বললেন, 'প্রমাণ দে যে তোর যোগ্যতা আছে।'

'কিভাবে দিতে হবে?'

'নিজের পেচ্ছাব খেতে পারবি?'

সুন্দরের মনে পড়ল। কোন এক নেতা নাকি তাই খেতেন। লোকে এই নিয়ে খুব হাসাহাসি করত। সেই লোকটা সংসারে থেকে যদি কাজটা করতে পারে তা হলে সে পারবে না কেন। সুন্দর মাথা নাড়ল, 'পারব।'

'বাঃ। আমারটা? অন্য লোকেরটা? পারবি?'

উত্তরটা জিবে আসছিল না। ভৈরবী বললেন, 'নিজেরটা করা ঢের সহজ। স্বার্থপর হলে কোনও অসুবিধে নেই। ঠিক আছে, আমাকে একটু ভাবতে দে।'

এখন এখানে মেঘ নেই তাই বাইরে শুতে অসুবিধে নেই। বিলের জলে স্নান আর নিরামিষ খাওয়া। ভৈরবী তার সঙ্গে প্রয়োজনের বাইরে কথা বলেন না। তিনি যে সারারাত জেগে থাকেন মন্দিরের সামনে, তা সে দ্বিতীয় রাতেই টের পেয়েছিল। এখন রাতের বেলায় এক রকম কিন্তু দিন কাটতেই চায় না সুন্দরের।

কিন্তু কাটল। দেখতে দেখতে চাঁদের রাত চলে এল। প্রথমে ফিনফিনে জ্যোৎস্না। বিলের ধারে সারারাত জেগে দাঁড়িয়েও নীলগাইয়ের দর্শন পেল না সে। কিন্তু যেদিন পূর্ণ চন্দ্র সেদিন বিকেলে ভৈরবী বেশ বদল করলেন। আজ তাঁর পরনে টকটকে লাল শাড়ি। গায়ে জামা নেই। সুডৌল কাঁধে অদ্ভুত মায়া। ভৈরবী বললেন, 'আজ পূর্ণিমা।'

সুন্দর বলল, 'কিন্তু নীলগাইদের যে দেখাই পাচ্ছি না।'

'ওরা ওদের মতো নানান জায়গায় ঘুরে বেড়ায়। ধৈর্য না রাখতে পারলে কিছুই পাওয়া যায় না। তোমার কপাল ভাল থাকলে আজ রাত্রেই স্বপ্ন পূর্ণ হবে।'

সন্ধ্যার আগেই জ্যোৎস্নায় পৃথিবী ভেসে গেল। রূপোর টাকার মতো চাঁদ লাফিয়ে উঠল আকাশে। ঘর খোঁজা পাখিরা হাহা রবে উড়ে গেল ডানায় হাততালির শব্দ তুলে। সুন্দর এই মায়ামায় বনানীর মধ্যে নিজেকে মিশিয়ে দাঁড়িয়েছিল প্রতীক্ষায়।

গাছে গাছে পাখিদের নীরবতা নেমে এল। জ্যোৎস্নায় পাহাড় জঙ্গল এখন সিনেমার মতো সুন্দর। সুন্দর মুগ্ধ হয়ে দেখছিল। সন্ধে পেরিয়ে রাত ঘন হল। মশার কামড় উপেক্ষা করতে আর পারছিল না সে। হঠাৎ দুদ্দাড় শব্দ হল। বিলের ওপাশে পাহাড়ের গা বেয়ে নীলগাইয়েরা নেমে আসছে বিলের দিকে। সেখানে পৌঁছতে হলে এই বিল সাঁতরে পার হতে হয়। বর্ধমানের পুকুরের সাঁতার কাটার অভিজ্ঞতা নিয়ে জলে নামল সে। প্রথম প্রথম তরতর করে এগিয়ে যাচ্ছিল। শেষ

পর্যন্ত হাতে পায়ে টান ধরল। কোনওরকমে বিল পার হয়ে মুখ তুলতেই সে নীলগাইদের দেখতে পেল । অদ্ভুত গোটা কুড়ি বলশালী প্রাণীর সঙ্গে তিনটে শিশু ঘুরছে। জলে দাঁড়িয়ে সে শিশুদের লক্ষ্য করতেই তাদের মায়েদের দর্শন পেয়ে গেল। একটা বাচ্চা মাঝে মাঝেই ছুটে গিয়ে বাঁটে মুখ রাখছে। এই স্বপ্নের জ্যোৎস্নায় যেন আকাশ থেকে নেমে আসা পরীরা তার সামনে। কোনওমতে কাছে পৌঁছে বাঁটে মুখ রাখতেই স্বর্গলাভ। জল ছেড়ে উঠল সুন্দর। সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে দাঁড়াল নীলগাইরা। সতর্ক চোখে তারা দেখল সুন্দরকে। কয়েক মুহূর্ত। তারপর দৌড় শুরু হল। ঝড়ের গতিতে ফিরে যাচ্ছে তারা। সুন্দর দৌড়তে লাগল। একটা বাচ্চা তাল রাখতে পারছে না। পাথরে হোঁচট খেয়ে পড়ে গেল সেটা। দৌড়ে কাছে গিয়ে তাকে তুলতেই সুন্দর দেখতে পেল মা নীলগাই দাঁড়িয়ে পড়েছে। তারপর উল্টো দিকে ছুটে আসতে লাগল সেটা। এই জ্যোৎস্নায় তার ভরা বাঁট চোখে পড়ল সুন্দরের। কিন্তু একই সঙ্গে আত্মরক্ষার তাগিদে সে বাচ্চাটাকে ঠেলে দূরে সরে এল। বাচ্চাটা এবার মায়ের দুধ খাচ্ছে। মা চুপচাপ দাঁড়িয়ে। কিন্তু দৃষ্টি সুন্দরের দিকে।

ওই দুধ খেতে পারলে আর কোনও চিন্তা নেই। সুন্দর পায়ে পায়ে এগোল। সঙ্গে সঙ্গে মা নীলগাই হাঁটা শুরু করল বাচ্চাটাকে নিয়ে। মরিয়া হয়ে ছুটে গেল সুন্দর আর তখনই প্রচণ্ড একটা লাথি তার শরীরটাকে ছিটকে দিল।

যখন জ্ঞান ফিরল তখনও জ্যোৎস্না রয়েছে কিন্তু নীলগাইয়েরা নেই। ডান পায়ে প্রচণ্ড ব্যথা। উঠে দাঁড়াতে সময় লাগল। রক্ত ঝরছে পা থেকে। ওই অবস্থায় জলে নামল সে। এই বিল পেরিয়ে তাকে ফিরতে হবে।

যখন জ্ঞান ফিরল তখন সে গুহার অন্ধকারে। সমস্ত শরীরে চাপ। সে নড়ে উঠতেই ভৈরবী বললেন, 'চুপচাপ শুয়ে থাকো। তোমার শরীরের সব যন্ত্রণা আমি নিচ্ছি।'

'কি করে?'

'এমনি করে।'

সে টের পেল। ভৈরবী তাকে জড়িয়ে শুয়ে আছেন। এবং ভৈরবীর শরীরে কোনও কাপড় নেই। তার ডান পায়ে যন্ত্রণা কমছিল। কি করে সে বিল পার হল, এখানে এসে তার কিছুই এখন মনে পড়ছে না। সে শুধু বলল, 'পারলাম না।'

'পারবে। আমি তোমাকে শিখিয়ে দেব।'

'দেবে?'

'হ্যাঁ। এতক্ষণ তুমি সুপ্ত ছিলেন। এখন জেগেছ। কেমন লাগছে?'

'ভাল।' যন্ত্রণা উপেক্ষা করল সে।

'আমার শরীর টের পাচ্ছ?'

'হুঁ'। বলামাত্র ভৈরবীর শারীরিক সম্পদ তাকে বিদ্ধ করল। সমস্ত শরীরের রক্ত উত্তপ্ত হয়ে উঠল।

ভৈরবী বলল, 'নিজেকে সংযত কর। শরীরকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে। চোখ বন্ধ করে মায়ের মুখ স্মরণ কর। তিনি তোমাকে শক্তি দেবেন।'

অথচ সমস্ত শরীরে প্রতিবাদের ঢেউ। সুন্দর নিজেকে সংযত রাখার চেষ্টা করল। এ কি! মায়ের জিভ বাইরে বের করা নেই। সেটা ভেতরে ঢুকে যাওয়ায় মাকে সম্পূর্ণ অচেনা লাগছে। ভিন্নতর আবেগ আরও উসকে দিচ্ছে তপ্ত রক্তধারাকে।

আগামী পূর্ণিমায় আবার নীলগাইয়েরা পাহাড় বেয়ে নেমে আসছে। পৃথিবী যতদিন থাকবে ততদিন স্বপ্নের নীলগাই জ্যোৎস্নায় জল খেয়ে যাবে। কিন্তু সুন্দরের সামনে এখন আগুনের রথ। ভৈরবী তার চারপাশে গণ্ডি কেটে দিয়েছে। জীবনে কখনও যে নীলগাইয়ের দুধ খায়নি তার তো আগুনের রথেও চড়া হয়নি।

এই সময় ভৈরবী ফিসফিসিয়ে বলল, 'কাকে চাই? নীলগাই না আমাকে?'

ভৈরবী ধড়মড়িয়ে উঠে পড়লেন। হেসে বললেন, 'আজ এই পর্যন্ত। এর নাম সাধনা। আমার ভৈরবরা এই সাধনাই আমাকে শিখিয়ে গেছেন। আবার সামনের পূর্ণিমায় আমরা এই সাধনায় বসব। কেমন!'

ভৈরবী নেমে গেছেন নীচে। তাঁর পুজো শুরু হয়ে গেল।

শরীরে একফোঁটা শক্তি নেই। মৃতদেহের মতো পড়েছিল সুন্দর। আশ্চর্য, আচমকা তার রক্ত একেবারে শান্ত হয়ে গেল। বদলে এক অবসাদ।

নীলগাইয়ের লাথি আর ভৈরবীর হঠাৎ উঠে যাওয়া যেন একই যন্ত্রণা ছড়িয়ে দিয়ে গেল তার শরীরে। পূর্ণিমা আসবে এক মাস পরে। তদ্দিন অপেক্ষা করে থাকতে হবে তাকে।

দুটো পথই একই লক্ষ্যে গিয়েছে।

কিন্তু ভৈরবী তাকে অগ্নিরথের সন্ধান দিতে পারে।

নীলগাইরা সেটা কখনও পারবে না।

রাত জাগতে জাগতে ঘুম এল, প্রেম এল না। অথচ আকাশে চাঁদ ছিল, নিচে নারকোল গাছের পাতায় বাতাস খেলা করছিল। যাকে বলে মাধবীরাত ঠিক সেই রকম ব্যবস্থা রেখেছিল প্রকৃতি। দেবলীনা বিমর্ষ চোখে ব্রজগোপালকে দেখল। ঘরের মেঝেতে আধশোয়া হয়ে ঢুলতে ঢুলতে স্বামী বেচারা ঘুমিয়ে পড়ল। অথচ কথা ছিল জেগে থাকার। নিঃশব্দে প্রেম এলে খপ করে ধরবে ব্রজগোপাল। নিদ্রাদেবী মদনদেবের চেয়ে প্রবল শক্তি ধরে, এই কথাটা জানা ছিল না দেবলীনার। জেগে ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেলল। একই ঘরে কেউ নাক ডাকিয়ে ঘুমালে জেগে থাকতে কারও ভাল লাগে? কানে তুলো গুঁজে দেবলীনা শুয়ে পড়ল খাটে। তার বুক থেকে আর একবার নিঃশ্বাস বেরিয়ে এল। আজও জীবনে প্রেম এল না। অথচ আসতে পারত। ব্রজগোপাল সতীনাথের গান গাইতে পারত, সুনীল অথবা জয়ের কবিতা বলতে পারত। যেভাবে পুরোহিতরা মন্ত্র পড়ে পড়ে একটা বাতাবরণ তৈরী করেন পুজোর সময়, যার ফলে মনে হয় দেবীমূর্তিতে প্রাণ প্রতিষ্ঠিত হল, সেইভাবে তার মনে প্রেম নিয়ে আসতে পারত ব্রজগোপাল ওই সব শুনিয়ে শুনিয়ে। কিন্তু এসব কিছুই না করে লোকটা ঘুমিয়ে পড়ল। এরকম হলে বেঁচে থাকতে কারও ভাল লাগে? তবু তাকে বেঁচে থাকতে হবে।

যেহেতু নিদ্রাদেবী যখন ভর করেন তখন মানুষ জানতে পারে না তাই দেবলীনা চোখ মেলার পর টের পেল সে-ও ঘুমিয়ে পড়েছিল। এখনও সকাল হয়নি আবার যাকে বলে ঊষাকাল ঠিক তাও নয়। সে মুখ ফিরিয়ে দেখল ব্রজগোপাল নেই। সাধারণত বেলা করে ওঠে লোকটা যার ফলে বাজার আসে দেরিতে। অফিসের ভাত দিতে হিমসিম খায় দেবলীনা। কিন্তু আজ শুধু এঘরেই নয়, ব্রজগোপাল ফ্ল্যাটেই নেই। মাটি থেকে অনেক ওপরে তাদের ফ্ল্যাট বলে সূর্যদেব সাত তাড়াতাড়ি ঢুকে পড়েন ঘরে কিন্তু এই কারণে বিছানা ছাড়ার পাত্র ব্রজগোপাল নয়। যদিও সে গতরাতে শুয়েছিল মেঝের ওপর কিন্তু গেল কোথায়! দেবলীনা ধন্দে পড়ল। এখন চা বানিয়েও লাভ নেই, ব্রজকিশোর কখন ফিরবে সে-ই জানে। ততক্ষণ আর একটু শুয়ে থাকা যাক। চোখ বন্ধ করে একটু ভাল লাগল দেবলীনার। এই প্রথম একটা বেহিসাবী কাজ করল ব্রজগোপাল। আলুনি হয়ে যাওয়া জীবনে

নতুন স্বাদ পাওয়া গেল। কে জানে, এখন থেকেই লোকটার পরিবর্তন শুরু হল কিনা।

ছায়া ছায়া ভোরে হাঁটতে ভাল লাগছিল ব্রজগোপালের। গত রাতে প্রেম আসার আগেই ঘুমিয়ে পড়েছিল সেই লজ্জায় সে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়েছিল। দেবলীনা ঘুমাচ্ছে দেখে একটু স্বস্তি পেয়েছিল। ভোরবেলাতেই মুখোমুখি হতে হয়নি তাকে। কিন্তু পথে নেমে তার বেশ ভাল লাগছিল। একটু ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা বাতাস বইছে। দিনের বেলায় হাজারবার দেখা এই পাড়াটাকেও এখন কিরকম সুন্দর লাগছে। ভোরবেলায় লোকে কেন হাঁটতে বের হয় তা বোঝা যাচ্ছে। আর একটু এগিয়ে সে বিরাট পার্কের মধ্যে ঢুকে পড়ে অবাক। প্রচুর মানুষ হাঁটছে হনহনিয়ে। বিচিত্র তাদের পোশাক। প্রায় প্রত্যেকের পাতায় বাহারি কেড্‌স। পুরুষদের পরনে হাফ প্যান্ট এবং সাদা গেঞ্জি। মেয়েরা সালোয়াড় কামিজ পরে তীরের মত এগিয়ে চলেছে। অল্প বয়সী মেয়েদের কেউ কেউ খাটো প্যান্ট পরেছে। তাদের সুডৌল পায়ের দিকে তাকিয়ে ব্রজগোপালেরই লজ্জা লাগল। কিরকম পুরুষ্ট টাইট পা। সিনেমায় এমন দেখা যায়। এবং তখনই তার মনে হল, দেবলীনার পা কিরকম? কোনদিন ভাল করে দেখা হয়নি। একটা ইংরেজি উপন্যাসে পড়েছিল যে মেয়ের ভাল পা নেই সে সুন্দরী নয়। দেবলীনা সুন্দরী কিন্তু এখন তো কোনভাবেই তাকে বলা যাবেনা, পা দেখাও।

অস্পৃয়মান একজোড়া সুডৌল পায়ের পিছু পিছু হাঁটছিল ব্রজগোপাল।। হঠাৎ কারা এল, 'গুড মর্নিং। কেমন আছেন?'

সে তাকাল। হাঁটাপথের পাশে পাতা বেঞ্চিতে একজন মহিলা বসে আছেন, তার দিকে হাসি হাসি মুখ করে। ফর্সা, সুন্দরী কিনা বলা যাচ্ছেনা কারণ তাঁর পা দেখা যাচ্ছেনা সালোয়ারে ঢাকা বলে। ভদ্রমহিলা ব্রজগোপালের বয়সী হবেন, পাশে একজন কাজের মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে দুটো ফ্ল্যাস্ক কাঁধে নিয়ে।

একদম চিনতে পারল না ব্রজগোপাল। তার মুখ হাঁ হয়ে গেল। ভদ্রমহিলা বললেন, 'বেশ লোক তো মশাই, এ্যাদ্দিন কোথায় উধাও হয়েছিলেন?'

'না-মানে-।' ব্রজগোপাল তোতলালো।

'ক' পাক হল?'

মানেটা বুঝতে পারল না ব্রজগোপাল। হাসার চেষ্টা করল, 'এই তো-!'

'আমার তিন হয়ে গিয়েছে। আসুন, চা খান। একেবারে হ্যাপি ভ্যালি টি

এস্টেটের গেটের কাউন্টার থেকে কেনা চা। বিস্তি, দু কাপ চা ঢাল। আসুন, বসুন

অগত্যা ব্রজগোপাল বসল। বিস্তি ফ্ল্যাস্ক খুলে চা ঢালছিল কাপে। ভদ্রমহিলা বললেন, 'তারপর? খবরটবর কি বলুন?'

উত্তর খোঁজার চেষ্টা করতেই ব্রজগোপাল দেখতে পেল আর একজন অল্পবয়সী মেয়ে জগিং করতে করতে সামনে দিয়ে যাচ্ছে। মেয়েটির পা দুটো বেশ ধবধবে। খাটো প্যান্ট বেশ আঁটোসাঁটো। ভদ্রমহিলা সেদিকে তাকিয়ে বললেন, 'আপনিও-!'

'আমিও? মানে?'

'ড্যাবডাব করে পা দেখা শুরু করে দিয়েছেন?'

'না, মানে-!'

'চুপ করুন! এই মেয়েগুলোও হয়েছে তেমনি। কথা নেই বার্তা নেই হাফ-প্যান্ট পরে স্বাস্থ্যচর্চা করতে পার্কে ঢুকে পড়েছে। আগে এসব ছিল না। গত বছর থেকে আরম্ভ হয়েছে। আর যত বুড়ো হাবড়া ওই পা গিলছে চোখ দিয়ে। ছিঃ।'

বিস্তি চায়ের কাপ হাতে ধরিয়ে দিতেই নাকে সুন্দর গন্ধ লাগল। চায়ে চুমুক দিয়ে সে বলল, 'বিশ্বাস করুন, আগে কখনও পা দেখিনি।'

'দেখার দরকারও নেই। এগুলোকে কি পা বলে? লিকলিকে, কাঠের মত, দেখতেই ভিখিরী ভিখিরী বলে মনে হয়। সংস্কৃত সাহিত্যে পায়ের বর্ণনা আছে, কলাগাছের মত পা। রম্ভার ছিল। ফ্যান্টাস্টিক।' ভদ্রমহিলা মাথা নাড়লেন।

ব্রজগোপাল আর এক চুমুক চা খেয়ে বলল, 'রম্ভাকে আমি দেখিনি।'

'কি করে দেখবেন। ইন্দ্র আটকে রেখেছে তাকে।' ভদ্রমহিলা কামিজ টেনে সালোয়াড় ঢাকলেন যদিও তার দরকার ছিল না। ব্রজগোপাল সেটা লক্ষ্য করতেই তিনি হেসে উঠলেন, 'বড্ড দুষ্টু তো আপনি!'

'দুষ্টু?'

'নয়তো কি? নিশ্চয়ই ভাবছেন আমার পা কিরকম? আমি মশাই ছেলেবেলায় ভালমন্দ খেয়ে বড় হয়েছি। লিকলিকে পা মোটেই নয়।'

'ও। একটা ইংরেজী উপন্যাসে পড়েছিলাম যার ভাল পা নেই সে সুন্দরী নয়।'

লজ্জায় দুমড়ে গেলেন ভদ্রমহিলা, 'আপনি খুব অসভ্য! আসুন না আমার ওখানে।'

'আপনার ওখানে?'

'বাঃ। সেবার যাবেন কথা দিয়েও যাননি! পায়ের ওপর সংস্কৃত সাহিত্যে অনেক আলোচনা আছে। দারুণ দারুণ ব্যাপার। ওসব নিয়ে কথা হবে।'

'ঠিক আছে!'

'আপনার চিবুকটা কিন্তু অদ্ভুত।'

'কিরকম?' আগ্রহ হল ব্রজগোপালের।

'কেমন মায়ায় জড়ানো।'

হঠাৎ হুড়মুড় করে কি যে কী একটা হয়ে গেল ব্রজগোপালের। বুকের ভেতর আঁতিপাতি করতে লাগল। আকাশটাকে কী দারুণ নীল বলে মনে হল। এমন কি অনেক দূরের কৃষ্ণচূড়া গাছে লাল আগুন জ্বলতে দেখতে পেল। সে বেঞ্চির ওপর কাপ নামিয়ে হনহন করে হাঁটা শুরু করল। হতভম্ব ভদ্রমহিলা প্রথমে কিছু বলতেই পারলেন না, শেষে যখন 'শুনছেন' বলে চেঁচালেন তখন ব্রজগোপাল বহুদূর এগিয়ে গেছে।

রোদ ওঠেনি ভাল করে, উঠব উঠব করছে সূর্য। তিরতিরিয়ে যে আলো পৃথিবীতে নেমেছে তার দিকে তাকিয়ে ব্রজগোপালের মনে হল তার একসময় শৈশব ছিল। শৈশবের কথা মনে আসতেই পিসিমার মুখে শোনা রূপকথার গল্প আর সেই সুবাদে সোনার পালঙ্কে শুয়ে থাকা রাজকন্যেকে যেন দেখতে পেল। ঘুমন্ত রাজকন্যাকে জাগাতে হত সোনার কাঠি রুপোর কাঠির ছোঁয়ায়। হঠাৎ সে বিড়বিড় করল, 'পৃথিবীর সব রাজকন্যারা তোমাতেই একত্রিত। তুমি আমার সমস্ত কাল ছিনিয়ে নিয়ে গেছ, হে প্রিয়তমা।' সঙ্গে সঙ্গে ব্রজগোপাল লাফিয়ে উঠল। আরে ব্বাস। তার মানে কবিতা এসে গিয়েছে। এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক লাঠি হাতে আসছিলেন। থমকে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কি হল?'

ব্রজগোপাল বলল, 'আজ্ঞে' কবিতা। কবিরা চিরকাল বেঁচে থাকে।'

দরজা খুলে দেবলীনা ভ্রূ কুঁচকে জিজ্ঞাসা করল, 'কোথায় গিয়েছিলে?'

ব্রজগোপাল সলজ্জ হাসি হাসল।

খানিকটা অবাক হয়ে দেবলীনা একপাশে সরে দাঁড়াল, 'কি ব্যাপার?'

'তোমাকে দেখছি!' নিঃশ্বাস নিল ব্রজগোপাল।

'তার মানে?'

'দেখছি কে বেশী পেলব? তুমি না ভোরের আলো?'

যেমন করে মানুষ উন্মাদ দ্যাখে সেই চোখের চাহনি রেখে সরে যাচ্ছিল দেবলীনা। ব্রজগোপাল ডাকল, 'লীনা।'

'কি?'

ব্রজগোপাল নিজের চিবুকে আঙুল রাখল। দেবলীনা দেখুক কী মায়া এখানে জড়ানো। সে বলল, 'আমাকে তোমার পা দেখাও লীনা!'

'পা?' নিজের পায়ের পাতা দেখল দেবলীনা। শাড়ির নিচে শুধু আঙ্গুলগুলোই দেখা যাচ্ছে, 'কি ব্যাপার?'

'আমার মধ্যে যে কী হচ্ছে তা তোমাকে বোঝাতে পারব না। তুমি আমার পৃথিবীর সেই রাজকন্যা যার জন্যে আমি এতকাল অপেক্ষা করেছি অথচ বুঝতে পারিনি। কী সুন্দর তুমি। কিন্তু তোমার সৌন্দর্য সম্পূর্ণ দেখা হবে না যতক্ষণ তোমার পা না দেখতে পারছি। তুমি ওই ডিভানে আধশোয়া হয়ে তোমার পা দেখাও, প্লিজ।'

'তোমার কি মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছে?'

'মাথা? না, মাথা আমার ঠিক আছে। পা দেখাও, প্লিজ।' ব্রজগোপাল এগিয়ে যেতে প্রায় দৌড়েই ভেতরের ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল দেবলীনা। নিশ্চয়ই কিছু হয়েছে। এই ভাষায় কথাই বলে না যে লোকটা সে আজ এ কি করছে? রাতের পর রাত একই বিছানায় পাশাপাশি শুয়ে যাকে ঘুমাতে দেখেছে সে এই সাতসকালে তার পা দেখতে চায়?

টেলিফোনের বোতাম টিপল দেবলীনা, 'কে? মা? তাড়াতাড়ি চলে এসো।' হ্যাঁ, ব্রজগোপাল! ভীষণ বিপদ।'

মায়ের সবে ঘুম ভেঙেছে, জড়ানো গলায় বললেন, 'আবার কি হল!'

'সেটা টেলিফোনে বলতে পারব না। ব্রজগোপাল হঠাৎ অন্যরকম হয়ে গিয়েছে।'

'আমি তোকে গতকালই বলেছিলাম আমার সঙ্গে চলে আয়। ওটা একটা কাঠখোট্টা যন্ত্র। ওর সঙ্গে থাকলে তুইও যন্ত্র হয়ে যাবি। যাচ্ছি, তবে তোর বাবাকে নিয়ে যাব। সব ঝক্কি আমি একাই সামলাবো আর তিনি গায়ে হাওয়া লাগিয়ে ঘুরবেন, এটা চলতে দেওয়া যায় না।' মা টেলিফোন রাখলেন।

অনেক কাকুতি মিনতি করেও যখন দেবলীনাকে দরজা খুলতে রাজী করানো গেল না তখন সাদা কাগজ আর ফেল্ট পেন নিয়ে বসল ব্রজগোপাল। ছেলেবেলায়

অভ্যেস ছিল, এখন দেখা গেল সে দিব্যি আঁকতে পারছে। শরীর নয়, শুধু মানুষীর পা। সারি সারি পা। দেখলেই বোঝা যায় মেয়েদের পা। তাদের গড়ন নানান রকমের। আঁকছে আর মাথা পেছনে হেলিয়ে দেখছে ব্রজগোপাল। তোমার পায়ের চড়াই উতরাই-এ গভীর অরণ্যের সুবাস, ঈর্ষায় রম্ভার বুকে রাবণের চিতা জ্বলবে যদ্দিন রামায়ণ থাকবে। বেল বাজল।

কলম হাতে নিয়েই দরজা খুলতে শ্বশুর-শাশুড়িকে দেখতে পেল সে। সঙ্গে সঙ্গে চিবুকে আঙুল রেখে মিষ্টি হাসল ব্রজগোপাল, 'ভাল আছেন?'

ঝড়ের মত ঘরে ঢুকলেন শাশুড়ি, 'সে কোথায়?'

'আমায় ভুল বুঝে অভিমান করেছে। বড় অভিমানিনী তো!'

'অভিমান? তোমার ওপরে? আমার মেয়ের তো মাথা খারাপ হয়নি।'

শাশুড়ি বন্ধ দরজার সামনে গিয়ে হাঁক মারলেন, 'লীনা, বেরিয়ে আয়। আমরা এসে গেছি। দেবলীনা।'

শ্বশুর বললেন, 'কি যে কর! সাতসকালে তোমার শাশুড়িকে ইনটারফেয়ার করতে হচ্ছে। তোমার মায়ের খবর কি?'

ব্রজগোপাল মাথা নাড়ল, 'নিজের শাশুড়িকে নিয়ে এত ব্যস্ত যে বউ-য়ের শাশুড়ির খবর নিতে পারিনি।'

দরজা খুলল দেবলীনা। মুখ নিচু।

শাশুড়ি হুঙ্কার দিলেন, 'তুমি আবার আমার মেয়েকে যন্ত্রণা দিয়েছ?'

'আজ্ঞে না।' ব্রজগোপাল আপত্তি করল, 'আমাদের মধ্যে বিয়ের এত বছর পরেও কোন প্রেম ছিল না। আজ হঠাৎ সেই প্রেম আমার বুকে এসে গিয়েছে। আসা মাত্র আমি লীনাকে সেটা জানাতে চেয়েছি। বইতে পড়েছি, প্রেম বড় ছোঁয়াচে, একজনের হলে আর একজনের হবেই। ওর জীবন প্রেমের অভাবে খাঁ খাঁ করত। দেখবেন এখন বেতের পাতার মত জ্বলতে থাকবে।'

'ননসেন্স! এই ভাষায় তুমি কথা বলতে শিখলে কবে? আমরা তোমার শ্বশুর-শাশুড়ি ; সেই সেন্সও হারিয়ে গেছে। কী রে লীনা?'

লীনা ঠোঁট ফুলিয়ে বলল, 'দ্যাখো না, সকালে বেরিয়ে ছিল, এসে থেকেই ওই ভাষায় কথা বলছে। তাছাড়া—!'

'তাছাড়া কি? বল, চুপ করে থাকিস না।'

'অসভ্যতা করছে।' মুখ নামাল দেবলীনা।

'অসভ্যতা? কি করেছে খুলে বল।'

'পা দেখতে চাইছে।'

'পা দেখতে চাইছে?' পৃথিবীর সব বিস্ময় শাশুড়ির গলায় ঝরে পড়ল, 'তুমি আমার মেয়ের পা দেখতে চেয়েছ?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ। পৃথিবীতে সেইসব মেয়েরাই সুন্দরী যাদের পা সুন্দর।' খাতাটা তুলে নিয়ে এল ব্রজগোপাল, 'এই দেখুন। পর পর জোড়া জোড়া পা এঁকেছি। দেখলে কি মনে হবে?'

শ্বশুর বললেন, 'সুইমিং পুলে সুইমিং কম্পিটিশনে ঝাঁপ দেবার আগে মেয়েদের পায়েদের মত। টিভিতে দেখেছি।'

'চুপ করো। জামাই-এর কাছে নিজের ইজ্জত নষ্ট করছ! হ্যাঁ, এইসব পা তুমি এঁকেছ?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'পারভার্সন। তুমি এত পারভার্টেড?'

'রম্ভার নাকি কলাগাছের মত পা। সংস্কৃত কাব্যে সেই পায়ের বর্ণনা করা আছে। যিনি করেছেন সেই কবি কি পারভার্টেড?'

শ্বশুর মশাই বললেন, 'কাশীরাম দাসকে অবশ্য কেউ কেউ ওই গালাগাল দেয়। কিন্তু পৃথিবীর সেরা সুন্দরীদের পা-ও সুন্দর হয়।'

'হল না। পা সুন্দর না হলে মেয়েরা সুন্দরী হয় না।' ব্রজগোপাল সংশোধন করে দিল, 'আমি আপনার মেয়ের পা পরীক্ষা করে রায় দিতাম। আমি অবশ্য জানি রায় ওর পক্ষেই যেত।'

'কি করে জানলে?'

'আমার মন বলছে।'

'তুমি কি বুঝতে পারছ না এসব বলা অসভ্যতা।'

'আমি তো পাঁচ পাবলিককে বলতে যাইনি। স্বামী স্ত্রীর ব্যাপার নিজেদের মধ্যে— থাকলে কি অসভ্যতা বলা যায়?'

'যায়। স্ত্রীকে প্রতিটি স্বামীর সম্মান করা উচিত।' শাশুড়ি বললেন, 'তাছাড়া তোমাদের বিয়ে হয়েছে অনেকদিন। এখন এইসব উদ্ভট শখ কেন?'

'শখ বলবেন না। এটা আমাদের জীবনমরণের প্রশ্ন।'

শ্বশুর বললেন, 'স্ট্রেঞ্জ! একটা পায়ের ওপর জীবনমরণ নির্ভর করছে। তাহলে

মা, তুই ওকে তোর পা দেখিয়ে দে।'

'শাট আপ! আমার মেয়েকে এমন নোংরা প্রস্তাব দিতে পারলে?' শাশুড়ি চিৎকার করে উঠলেন, 'না। এ বাড়িতে তুই আর নিরাপদ নস। চল, আমার সঙ্গে।'

হঠাৎ খেয়াল হল ব্রজগোপালের। সে শ্বশুরের পাশে চলে এল, 'আচ্ছা, ওনাকে আপনার কি সুন্দরী বলে মনে হয়?'

প্রশ্নটা শোনামাত্র শাশুড়ি সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে অপাঙ্গে শ্বশুরের দিকে তাকালেন। সেই দৃষ্টি দেখে শ্বশুর ভেজা মুড়ির মত মুখ করে বললেন, 'একসময় তো ছিলই। বাবা অনেক সন্ধান করে ওঁকে এনেছিলেন।'

'যখন সুন্দরী বলে মনে হত তখন আপনি ওঁর পা দেখেছেন?'

'পা?' শ্বশুর শাশুড়ির দিকে তাকালেন।

শাশুড়ি ফোঁস করে উঠলেন, 'ছি ছি ছি। এখন মা মাসীর পা নিয়ে টানাটানি করছে। ও নীলা, লোকটার হয়েছে কি?'

এতক্ষণে লীনা বলল, 'আমি বুঝতে পারছি না মা। ও কাঠখোট্টা ছিল, রোমান্টিক ছিল না কিন্তু এমন কথা কখনও বলত না। ওর কথা শুনে, কি বলব মা, এতদিনে এই প্রথম হাসি পাচ্ছে।'

'তোর হাসি পাচ্ছে?'

'একটা মানুষ রাতারাতি পাল্টে গেলে হাসি পাবে না?'

'তোর ভয় পাচ্ছে না?'

'নাঃ। এখন পাচ্ছে না।'

'ও। তাহলে তো আমার দরকার নেই। আর কখনও আমাকে ডাকবি না। এত নরম হলে চলে না লীনা। পুরুষ মানুষের হাল শক্ত করে ধরতে হয়।' শাশুড়ি তাকালেন শ্বশুরের দিকে, ' তোমার কি হল?'

'আজ ব্রজগোপাল আমার ভুল ধরিয়ে দিল।'

'ভুল?'

'হ্যাঁ। তোমার পা আমি কখনই দেখেছি বলে মনে পড়ছে না। চল্লিশ বছর একসঙ্গে থেকেও পরস্পরের কতটা আমরা জানতে পারি বল?'

'চল। আর এখানে নয়। এইজন্যেই বলে অসৎ সংসর্গে নরকবাস। তুমি আর কখনও এ বাড়িতে আসবে না। চল।' প্রায় তাড়িয়ে নিয়ে গেলেন শাশুড়ি।

দরজা বন্ধ করতে করতে হঠাৎ ব্রজগোপালের মনে হল সে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে।

ফিরে এসে ধুপ করে বসে পড়ল সোফায়। অসৎ। সে অসৎ? একথা কেউ কোনদিন তাকে বলেনি। যার বুকে প্রেম এসেছে সে কি অসৎ হয়? তাহলে ধরে নিতে হবে পার্কে প্রেম এসেছিল। শাশুড়ি আমার চলে গিয়েছে।

'কি হল তোমার?' দেবলীনা যেন অবাক হয়েছে।

'কিছু না।' নিঃশ্বাস ফেলল ব্রজগোপাল, 'আজ বাজারে যাব না।'

'ঠিক আছে যেও না। তুমি তো ভালবাস, আজ খিচুড়ি করব। সঙ্গে ওমলেট।'

'আমি খুব দুঃখিত লীনা।'

'কেন?'

'তোমার পা দেখতে চেয়েছি বলে।'

'বাঃ, হঠাৎ দুঃখ পেলে কেন?'

'উচিত নয়। প্রত্যেকের পা তার নিজস্ব সম্পত্তি। অন্যের দেখতে চাওয়া ঠিক নয়। তোমার মাকে ফোন করে জানিয়ে দিও।'

'তোমার কি হল বল তো?'

'কিছু না।'

দেবলীনা কাছে এসে বলল, 'এ্যাই শুনছো!'

'উঃ।'

'তুমি আমার সম্পর্কে যা বলছিলে তা সত্যি?'

'কি?'

'আমি পেলব, আমি ভোরের আলো!'

'তখন সত্যি মনে হয়েছিল।'

'এখন মনে হচ্ছে না?'

'বুঝতে পারছি না।'

'কেন? পা দেখাইনি বলে। উঃ, কি করে দেখাই?'

'থাক. দেখাতে হবে না।'

'না। দ্যাখো। আজকাল এত অন্যমনস্ক থাকি যে নিজের পরিচর্যা করতে ভুলে যাই। মাসখানেক হল ক্রীম লাগাইনি। সেই যে ছেলেবেলায় ব্লেড দিয়ে চেঁচেছিলাম কী বিশ্রী হয়ে আছে। কাউকে দেখানো যায়, বল? শাড়ি তুলে হাঁটু পর্যন্ত পা দেখাল লীনা। নরম কালো গুল্মে ঢাকা রয়েছে পায়ের চামড়া। মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাই দেখতে দেখতে ব্রজগোপাল বলে উঠল চনমনিয়ে, ' হে অরণ্য, কথা কও!'

যদি প্রেম

রাত দুপুরে কখনও ঘুম ভাঙে না ব্রজগোপালের, কিন্তু আজ ভাঙল। চোখ খোলা মাত্র সে দেখতে পেল বিছানায় দেবলীনা নেই। ঘরে নীল আলো জ্বলছে। বিয়ের মাস কয়েক পর থেকেই দেবলীনা আলাদা খাটের দাবি জানিয়ে এসেছে কিন্তু নানান অজুহাতে এড়িয়ে গিয়েছে ব্রজগোপাল। পৃথিবীর কোন সভ্য দেশের স্বামী-স্ত্রীরা এক খাটে রাত কাটায় না, প্রত্যেকের ব্যক্তিগত খাট থাকা উচিত—এ সব কথা একদম ভাল লাগত না তার।

ব্রজগোপাল পাশ ফিরে শুতে গিয়ে দেখতে পেল জানলার গ্রিলে সিল্যুট হয়ে দাঁড়িয়ে আছে দেবলীনা, দৃশ্যটি দেখে ওর মনে পড়ল যৌবনের সিনেমাগুলোর কথা। তখন ছবিতে মায়াবী মাধবী রাতের কথা প্রায়ই থাকত। নারকোল গাছের পাতার ফাঁক দিয়ে ঘুমঘুম চাঁদের আলো জানলায় স্বপ্ন ছড়াত। যেহেতু তাদের ফ্ল্যাট পাঁচতলায় তাই নারকোল গাছ নাগাল পায়নি কিন্তু চাঁদ লেপ্টে আছে আকাশে। তার আলোয় দেবলীনা মাখামাখি। পিছন থেকে অবশ্য সিল্যুট সিল্যুট দেখাচ্ছে। ঘুম ভাঙার অস্বস্তি মুহূর্তে উধাও, ব্রজগোপাল পা টিপে টিপে দেবলীনার দিকে এগোতেই শব্দটা শুনতে পেল। বুকের পাঁজরে ধাক্কা খেয়ে একমুঠো বাতাস নাকের ফুটো দিয়ে বেরিয়ে আসার সময় জানিয়ে দিয়ে গেল পৃথিবীতে দুঃখ আছে। ব্রজগোপাল মুহূর্তেই পাথর। এত বড় দীর্ঘনিঃশ্বাস দেবলীনার কাছ থেকে সে কখনও কল্পনা করেনি। খুব চাপা গলায় সে ডাকল, 'দেবী, দেবলীনা!'

দেবলীনা তাকাল না। খাজুরাহোর মূর্তি হয়ে এক পায়ের ওপর শরীরের ভর রেখে জানলার গ্রিলে গাল চেপে বলল, 'কেন উঠলে? বেশ তো ঘুমাচ্ছিলে!'

'সে তো রোজ ঘুমাই। কিন্তু আজ তুমি না ঘুমিয়ে জানালায় দাঁড়িয়ে আছে কেন?'

'আজ? আমি তো প্রতিটি রাতেই এখানে দাঁড়িয়ে থাকি।'

'সে কি? প্রতিটি রাতে? কেন? আমাকে তো কখনও বলনি?' ব্রজগোপাল বেশ উত্তেজিত হয়ে স্ত্রীর পাশে চলে এল।

'বলব কেন? তুমি কি কখনও জানতে চেয়েছ?'

'আশ্চর্য! না জানতে পারলে জিজ্ঞাসা কী করে করব?'

'ওই তো! ওইখানেই তফাৎ। যার জানার সে ঠিক জেনে নেয়। কড়া নেড়ে

তাকে জানাতে হয় না। ওটা ভেতর থেকে আসে।' আলতো একটুকরো হাসিতে ভাঙা কাচের ধার। ব্রজগোপাল কী করবে বুঝতে পারছিল না প্রথমে, তারপর বেশ খানিকটা আবেগ গলায় নিয়ে বলল, 'তোমার কী হয়েছে দেবী?'

'থাক!' দেবলীনা শরীরের ওজন অন্য পায়ে তুলে দিল।

'না। থাকবে কেন? বলো, প্লিজ।'

'বললে তোমার খারাপ লাগবে।' দেবলীনা উদাসী গলায় বলল।

ব্রজগোপাল তখন মরীয়া। সে অনুনয় করতে লাগল।

দেবলীনা জানলা থেকে সরে গেল দেওয়ালের দিকে। নীল আলো নিভিয়ে দিয়ে টিউবলাইটের সুইচ টিপল। সঙ্গে সঙ্গে ঘরের রঙ ক্যাটকেটে হয়ে গেল। ব্রজগোপালের মনে হল রাত দুপুরে এমন আলো সহসা করা যায় না।

দেবলীনা চেয়ারে বসে বলল, 'যখন এত করে জানতেই চাইছ তখন বলি। বিয়ের ছয় মাস পর থেকে কথাটা বুকের মধ্যে ছটফট করছে কিন্তু বলতে পারিনি। তোমাকে কষ্ট দিতে চাইনি। তার চেয়ে নিজেই রাত জেগে নিজেকে কষ্ট দিতাম। আজ বলছ বলে, কিন্তু তোমাকে একটা কথা দিতে হবে।'

'কী?' ব্রজগোপালের পাকস্থলী শুকিয়ে যাচ্ছিল।

'তুমি কষ্ট পাবে না। কিছুতেই না। কথা দাও।'

'সেটা না শুনে বলব কী করে?'

'বলতে হবে। না বললে আমি মুখ খুলব না।'

দমবন্ধ করে একটু ভাবল ব্রজগোপাল। তারপর বলল, ' বেশ। কথা দিচ্ছি!'

চিবুক ওপরে তুলল দেবলীনা। এই ভঙ্গিতে তাকে খুব আদুরে সুন্দরী মনে হয়। বেশ কয়েকটা ফটো আছে ওর ওই পোজে। দেবলীনা বলল, 'বিয়ের আগে তো তোমাকে চিনতাম না। দেখতে যখন এসেছিলে বুঝতে পারিনি। বিয়ের পর একটু একটু করে বুঝতে ছয় মাস লেগে গেল। তখন বুঝলাম আমি তোমাকে কিছুতেই ভালবাসতে পারছি না। বিশ্বাস করো, অনেক চেষ্টা করেছি ভালবাসার! কিন্তু মনে কিছুতেই তোমার জন্যে ভালবাসা আসেনি।'

পায়ের ফোঁড়া ফেটে বায়াপসি করে প্যাথলজিস্টট যেন বলে দিল ক্যানসার হয়েছে, এমন অনুভূতি হল ব্রজগোপালের, 'তুমি আমাকে ভালবাস না?'

'নাগো। যাকে ভালবাসি না তার সঙ্গে বিছানায় শোওয়া কি খারাপ ব্যাপার বলো তো? বলো, খারাপ কি না?'

'তা তো ঠিকই।' বিড় বিড় করল ব্রজগোপাল।

সেই খারাপ কাজটাও রোজ রাত্রে আমাকে করতে হচ্ছে। অথচ বিয়ের আগে উপন্যাস পড়ে সিনেমা দেখে মনে মনে কত কল্পনা করতাম। আমার স্বামীকে আমি কত ভালবাসব, কত সোহাগ করব। প্রতিটি রাত মধুর হবে আমাদের। কোথায় হল? ভগবান যে বাড়া ভাতে ছাই দিয়ে বসে আছেন। তা তো তিনি দেবেনই। পুরুষমানুষ তো। মেয়েদের সৌভাগ্য সইবেন কেন? বলো?'

ব্রজগোপালের কানে এসব ঢুকছিল না। চার বছর ধরে সংসার করার পর তার সুন্দরী স্ত্রী এ কথা বলছে? সে বিড় বিড় করল, 'কিন্তু....!'

'কী কিন্তু? লজ্জা করো না, বলো।'

'আমাকে যে ভালবাস না তা এত দিন বুঝতে পারিনি আমি।'

'কী করে বুঝবে? তোমার মাথায় ওসব থাকলে তো!'

খুব কান্না পেতে লাগল ব্রজগোপালের। নিজেকে খুব অসহায় লাগছিল তার। তবু মরীয়া হল, 'কিন্তু তুমি যে আমার স্ত্রী—!'

'তাতে কী হয়েছে? সম্বন্ধ করে বিয়ে হওয়া প্রতিটি বাঙালি মেয়ে কি তার স্বামীকে ভালবাসে ভেবেছ? দাঁতে দাঁত চেপে মানিয়ে নিয়ে থাকে।'

'প্রেম করা বিয়ে তো প্রায়ই ভেঙে যাচ্ছে।'

'যাচ্ছে। নিজেরা প্রেম করেছে, নিজেরাই ভাঙছে। এখানে তো প্রেমই হল না।'

ব্রজগোপাল খাটে এসে বসল। তারপর মনে আসতেই প্রশ্নটা করল, 'সত্যি কথা বলবে? তুমি কি কাউকে ভালবাস?'

'দুর! ভালবাসতে পারলে তো বেঁচে যেতাম। আমার কপালে কি সেটা লেখা আছে? এই যে পাশের ফ্ল্যাটের অঞ্জলি বউদির কথা ভাবো, তারও একজন দুপুরের ঠাকুরপো আছে। সপ্তাহে তিন দুপুর আসে। আমার কথা আর বোলো না।'

কথাটা শুনে একটু স্বস্তি পেল ব্রজগোপাল। না, কোনও প্রতিদ্বন্দ্বী নেই। সে বিনীত গলায় বলল, 'আচ্ছা, আমি কী রকম হলে তুমি ভালবাসতে পারতে? মানে আমি চেষ্টা করতে পারি সেরকম হতে।'

'পারবে না।'

'তবু।'

'উত্তমকুমারের মতো হাসতে পারবে?'

'না।' দ্রুত মাথা নাড়ল ব্রজগোপাল।

'সুনীল গাঙ্গুলির মতো লিখতে পারবে, দেখা হবে চন্দনের বনে?'

এক সেকেন্ড ভাবল ব্রজগোপাল। তারপর মাথা নাড়ল, 'না।'

'মদ খাবে। দামি মদ। অল্প। কিন্তু মাতাল হবে না। পারবে?'

'মদ খাব?'

'হুঁ। পুরুষমানুষ অল্প স্বল্প ড্রিঙ্ক করে কবিতা বলবে, সিগারেটের গন্ধ ঠোঁটে থাকবে, বৃষ্টিতে ভিজে এলে হ্যাঁচ্চো করবে না, তবে তো পুরুষ? আসলে তুমি একটা ছেলে কিন্তু পুরুষের গন্ধ তোমার শরীরে নেই।' দেবলীনা উঠে এল। ব্রজগোপালের কাঁধে হাত রেখে বলল, 'যাও শুয়ে পড়। রাত জাগলে তোমার আবার শরীর কষে যায়। ঘুমিয়ে পড়। আমি জানলায় দাঁড়িয়ে আর একটু চাঁদ দেখি ততক্ষণ।' আলো নিভিয়ে দিল দেবলীনা, কিন্তু নীল আলো আর জ্বলল না।

ব্রজগোপাল ভাল চাকরি করে। অফিসে তার সহকর্মী অতীশের খ্যাতি আছে প্রেমিক হিসেবে। কলকাতা শহরে তার প্রাক্তন প্রেমিকার সংখ্যা অন্তত তেত্রিশ। অতীশ অকৃতদার, লেক গার্ডেন্সে নিজস্ব ফ্ল্যাট আছে। কিন্তু সেই ফ্ল্যাটে সে বান্ধবীদের কখনও নিয়ে যায় না। সে বলে, বাসস্থান আর কর্মস্থানে প্রেমকর্ম করা ঘোরতর বোকামি। অতীশ কিঞ্চিৎ মদ্য পান করে, বিদেশি সিগারেট খায়, আর বলতে নেই, ওর হাসিটি সত্যি সুন্দর। অফিসে পৌঁছেই ব্রজগোপাল অতীশের ঘরে চলে এল, 'অতীশ তুমি সুনীল গাঙ্গুলির কবিতা পড়েছ?'

চোখ বন্ধ করল অতীশ, 'নির্মলা আমাকে পড়িয়ে ছেড়েছে।'

'নির্মলা?'

'আমার সাত নম্বর প্রেমিকা। সুনীলের নীরা সিরিজের ভক্ত। ওকে খুশি করতে সুনীলের সব কবিতা পড়েছি।'

'সে কি?'

'শুধু সুনীল। আমার আঠারো নম্বরের প্রেমিকা স্বপ্নাবলী যাদবপুরের ছাত্রী ছিল। ও আবার বুদ্ধদেব গুহর ভক্ত ছিল। ফলে আমি বুদ্ধদেব গুহর সব বই পড়ে আঠাত্তর রকম পাখির আর বাইশ রকম গাছের নামের একটা লিস্ট বানিয়েছিলাম। প্রেম করতে হলে সিনসিয়ার হতে হয়, বুঝলে।' অতীশ লাইটার জ্বেলে বিদেশি সিগারেট ধরাল।

স্তব্ধ হয়ে গেল ব্রজগোপাল, সেই সঙ্গে কিঞ্চিৎ পুলকিত। তার মনে হল

অতীশকে দেখলে দেবলীনা প্রথম প্রেমিকা পেতে পারে যদিও তাকে চৌত্রিশ নম্বর প্রেমিকা হতে হবে। সে চুপচাপ নিজের ঘরে চলে এল।

আজ তার কাজে মন নেই। কেবল দেবলীনা আর অতীশকে একসঙ্গে কল্পনা করছে। এর মধ্যে সে ভেবেছে অতীশকে নকল করলে কি রকম হয়? অতীশ যা যা করে সেই করলে দেবলীনার আক্ষেপ দূর হতে পারে। টিফিনের পর অতীশ ইন্টারকমে তাকে ডেকে পাঠাল। গিয়ে আড়ষ্ট হল ব্রজগোপাল। অতীশের টেবিলের উল্টো দিকে একজন সুন্দরী বসে আছেন হাসি হাসি মুখে।

অতীশ বলল, 'আরে এসো এসো। তোমার কথাই ভাবছিলাম।

'আ-মা-র কথা?'

'বন্যা, তোমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই। আমার সহকর্মী, ব্রজগোপাল।'

'যাঃ।' শরীর কাঁপিয়ে অবিশ্বাস জানাল, বন্যা।

'যাঃ। মানে? সত্যি ও ব্রজগোপাল।' অতীশ দৃঢ় গলায় বলল।

'বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছে। আসলে এত আধুনিক নাম শুনি যে নতুন কারো সঙ্গে আলাপ করলে বৈচিত্র্য খুঁজে পাই না। ব্রজগোপাল। বিশ্বাস করুন, এই মধ্যযুগীয় নামটি অনেক কাল পরে শুনলাম।' বন্যা চোখ ছোট করল।

অতীশ বলল, 'পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ প্রেমিকের নাম ব্রজগোপাল।'

'এই কী হচ্ছে কি?' ব্রজগোপাল প্রতিবাদ করল।

'কেন? শ্রীকৃষ্ণকে শ্রেষ্ঠ প্রেমিক বলতে তোমার আপত্তি আছে? বসো।'

ব্রজগোপাল বসল।

অতীশ বলল, 'বন্যা, তুমি কী বলছিলেন বলো।'

'নাও। ওর নাম শুনে আমার সব গুলিয়ে গেছে। এখন থাক।'

'দুর। বলেই ফ্যালো।'

'তুমি বলো।'

অতীশ হাসল, 'ব্রজগোপাল। বন্যাদের একটা লোন অ্যাপ্লিকেশন তোমার কাছে পড়ে আছে। বুঝতেই পাচ্ছ, ওই ব্যাপারে যদি একটু সাহায্য কর—।'

বন্যা বলল, 'ইস্, আমার ভারী লজ্জা করছে। আপনি কিছু মনে করলেন, না?'

ব্রজগোপাল হকচকিয়ে গিয়েছিল। কোনও মতে জিজ্ঞাসা করল ' কোম্পানির নাম কী?

'বন্যা অ্যান্ড বন্যা।' অতীশ জানাল। বন্যা এমন ভাঙ্গীতে হাসল যেন নদীর দু'কূল ভেসে গেল অথচ গেল না।

ব্রজগোপালের মনে পড়ল। লোন অ্যাপ্লিকেশনটা ইন্সপেক্টারকে দেওয়া হয়েছে তদন্ত করার জন্যে। এখনও রিপোর্ট তার হাতে আসেনি।

সে বলল, 'ঠিক আছে। দেখব।।'

বন্যা বলল, 'সত্যি কি ভাল মানুষ আপনি। পুরোন কালের নাম তো, মনে দয়া মায়া থাকবেই। আসুন না আমার ওখানে, একটু পায়ের ধুলো পেলে খুব খুশি হব। চলুন, যাবেন?'

'আজ?'

অতীশ বলল, 'যাও না। একজন সুন্দরী ভদ্রমহিলার সাদর নেমন্তন্ন কোন মূর্খ প্রত্যাখ্যান করে হে? আজ সন্ধ্যায় আমি ফেঁসে গেছি, খুব ফেঁসে গেছি, নইলে আমিই চলে যেতাম।'

বন্যা ব্যাগ থেকে একটা কার্ড বের করে ব্রজগোপালের হাতে দিয়ে বলল, 'সাড়ে সাতটা নাগাদ হ্যাঁ, আমি অপেক্ষা করব।'

ব্রজগোপাল কার্ডের ওপর নজর রাখল। বন্যা রায়। ঠিকানাটা সাহেবপাড়ার। চকচক করছে কার্ডটা।

তিন

অফিস থেকে বেরিয়ে ব্রজগোপালের মনে হল তার বাড়িতেই ফিরে যাওয়া উচিত। যতই মন উচাটন হোক, বন্যার ওখানে যাওয়াটা মোটেই ঠিক কাজ হবে না। তাছাড়া কেন যাবে সে? একজন মহিলা যতই সুন্দরী হোক, ঢল ঢল কথা বললেই গলে পড়তে হবে? চরিত্র বলে কিছু নেই? তাছাড়া ওই লোন অ্যাপ্লিকেশনটা। নিশ্চয়ই ওর মধ্যে বেশ গোলমাল রয়েছে নইলে অতীশকে ধরবে কেন?

অতএব ব্রজগোপাল বাড়ির পথ ধরল। একটা ট্যাক্সিতে চেপে আসার সময় দেবলীনার ইচ্ছের কথা মনে পড়তেই সে চৌরঙ্গিপাড়ায় গাড়ি থামিয়ে বেশ দামি এক বোতল মদ আর বিলিতি সিগারেটের প্যাকেট কিনে নিল। ব্রজগোপাল জীবনে কখনও মদ্যপান করেনি বললে মিথ্যে বলা হবে। বিয়ের আগে প্রতি বছর ক্রিসমাস ইভে বন্ধুদের সঙ্গে বসে এক পেগ হুইস্কি খেত। খেত মানে খেতে হত। বিচ্ছিরি লাগত। না খেলে বন্ধুরা তাকে মফস্বলি বলে খ্যাপাবে বলে গিলতে হত। তা সে সব অনেকদিন হয়ে গেল।

ট্যাক্সি ছেড়ে ফ্ল্যাটের দরজায় পৌঁছে বেল টিপল ব্রজগোপাল। উত্তমকুমারের হাসি, সুনীল গাঙ্গুলির কবিতা আপাতত হচ্ছে না বটে কিন্তু একটু হুইস্কি আর বিলিতি সিগারেট তাদের ফ্ল্যাটের আবহাওয়া পাল্টে দেবেই, সন্দেহ নেই যদি দেবলীনা একটু টেস্ট করতে চায় তো সে উদার হবে। বাইরের কেউ তো দেখতে পাচ্ছে না। বন্যা রায়কে দেখলেই মনে হয় হেভি মাল টানে। সংযম, ব্রজগোপাল চোখ বন্ধ করল, সংযম না থাকলে সে ওই আমন্ত্রণ ঝেড়ে ফেলে বাড়িতে চলে আসত না। দেবলীনাকে, এখন নয়, পরে ব্যাপারটা বলে ক্রেডিট নিতে হবে।

দরজা খুলল দেবলীনা। এক পলক দেখে ফিরে গেল ভিতরে। দরজা বন্ধ করতে করতেই গলাটা শুনতে পেল ব্রজগোপাল, 'কী খবর তোমার?'

শাশুড়ির দিকে ফিরে তাকাল সে। সিঙ্গল সোফা পুরোটা খালি করে বসে আছেন মহিলা। সুপুরি গাছের মতো রোগা এবং তেমন লম্বা মহিলার কণ্ঠস্বর অত বাজখাঁই হয় কী করে তা ঈশ্বরই জানেন। ব্রজগোপাল মাথা নাড়ল, 'ভাল।'

'ভাল তো হবেই। মেয়েটিকে কাঁদিয়ে ভাসিয়ে তুমি ভাল থাকবেই।'

ব্রজগোপাল অসহায় চোখে দেবলীনাকে খুঁজল। সে এই ঘরে নেই।

'চুপ করে আছ কেন? ব্যাটাছেলের চুপ করে থাকা আমি একদম পছন্দ করি না।'

'আমি কী বলব।'

'কী বলবে? ও তোমাকে ভালবাসতে পারল না কেন? আমার সমস্ত আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব, পাড়ার লোকজন দেবলীনার প্রশংসায় পঞ্চমুখ। সবাই বলে আহা, কি নরম মনের মেয়ে। এর ভালবাসা যে পাবে সে ধন্য হয়ে যাবে। শুধু তোমার ইচ্ছে নেই নিজেকে ধন্য করার। কেন?'

'আমারও ইচ্ছে আছে।'

'ইচ্ছে থাকলে উপায় হয়. আর ভালবাসা হয় না? ওর মতো মেয়ের ভালবাসা তোমার প্রতি নেই আর দিব্যি খাচ্ছ দাচ্ছ ঘুমচ্ছ। ছিঃ। আমি হলে আত্মহত্যা করতাম। তা এই অবস্থাটা তো চলতে দেওয়া যায় না। খবর পেয়েই ছুটে এসেছি।'

'আমি তো চেষ্টা করছি—!'

'চেষ্টা করছ? কী চেষ্টা করছ? হাতে ওটা কিসের প্যাকেট? গিফ্‌ট নিয়ে এসেছ ওর জন্যে? এটা অবশ্য একটা ভাল চেষ্টা। মেয়েদের মন গিফ্‌ট পেলে নরম হয়। তা কী গিফ্‌ট আনলে দেখি।' হাত বাড়াল শাশুড়ি !'

বুকের মাঝখানটা ধক্ করে উঠল ব্রজগোপালের। সে প্যাকেটটাকে আঁকড়ে ধরে দ্রুত মাথা নাড়ল, 'না না-এটা-মানে--!'

'অমন করছ কেন? মেয়ের সঙ্গে আমি খুব ফ্র্যাঙ্ক। তোমার লজ্জা পাওয়ার কোনও কারণ নেই। দেখি, কী রকম রুচি তোমার!'

'আজ্ঞে, এটা ঠিক গিফ্‌ট নয়।'

'গিফ্‌ট নয়?'

'না। এটা আমার ব্যক্তিগত জিনিস।'

'ব্যক্তিগত জিনিস। আই সি। এতক্ষণে বুঝলাম কেন তোমাকে আমার মেয়ে এত দিনেও ভালবাসতে পারছে না। তুমি নিজের অনেক কিছু ওর কাছে আড়াল করে রাখো। তুমি নিশ্চয়ই স্বার্থপর, স্বেচ্ছাচারী এরকম লোককে কেউ ভালবাসতে পারে?'

'আজ্ঞে, আমি, আমি—।'

শাশুড়ি উঠে এলেন সামনে, 'শোন, স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কোন গোপনীয়তা রাখা ঠিক নয়। তাতে ভালবাসা আসে না। যেটা ব্যক্তিগত ভাবছ সেটা দু'জনের করে নাও। দেখি কী আছে প্যাকেটে। দাও।' হাত বাড়িয়ে প্যাকেটটা নিয়ে নিলেন তিনি। ব্রজগোপালের হাত অসাড়, মনও। অথচ দেবলীনা এ ঘরে নেই।

'একি! সিগারেটের প্যাকেট? তুমি জান না সিগারেট খেলে ক্যান্সার হয়। তোমার ক্যান্সার হলে জমানো টাকা সব শেষ হয়ে যাবে। স্ত্রীকে রাস্তায় দাঁড় করানো যাদের মতলব তারাই সিগারেট ফোঁকে। ছি ছি ছি। এটা এত ভারী কেন? সর্বনাশ। এ যে দেখছি মদের বোতল। তুমি মদ খাও?' শাশুড়ির চোখ গোল হয়ে গেল।

'না-মানে—।'

'না মানে আবার কি? মুখের ওপর মিথ্যে কথা! হাতে মদের বোতল নিয়ে বাড়ি ঢুকছ আবার—! ছি ছি ছি। না, আর এক মুহূর্ত এখানে নয়। দেবী, দেবী।' শাশুড়ি যেন আর্তনাদ করল।

ব্রজগোপাল দেখল দেবলীনা দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে। শাশুড়ি বলল, 'লুক, সিগারেট, মদ। তুই এত কথা বলেছিস এসব নেশার কথা তো বলিসনি? স্বামীর দোষ আর কতদিন আড়াল করবি? এসব দেখে তোর মনও তো খাঁ-খাঁ করছে। শোন, আমার সঙ্গে চল। তোর আর এখানে থাকার দরকার নেই।'

হঠাৎ ব্রজগোপালের ভিতরে কেউ যেন গা ঝাড়া দিয়ে উঠল, 'নিয়ে যাবেন মানে? ও কি স্যুটকেস না হাতব্যাগ? আর যদি নিয়ে যেতে অত ইচ্ছে হয় তাহলে লিখে দিয়ে যান যে আপনারা স্বেচ্ছায় ওকে নিয়ে যাচ্ছেন, ও সই করুক তাতে।'

'কেন? লিখতে হবে কেন?'

'তার উত্তর আমি কোর্টে গিয়ে দেব।'

'কোর্ট? আমাকে তুমি কোর্টঘরে নিয়ে যাবে?' এই প্রথম দেবলীনা কথা বলল।

'বাধ্য হচ্ছি। শুধু তাই নয়, এই ঘরে বসে মদ সিগারেট খাব। বন্যা রায়কে নিয়ে ফুর্তি করব। সুনীল গাঙ্গুলির কবিতা বলব, উত্তমকুমারের মত হাসব।' বেশ জোরের সঙ্গে শব্দগুলো উচ্চারণ করল ব্রজগোপাল।

'বন্যা রায়। বন্যা রায় কে?' শাশুড়ি প্রশ্ন করলেন।

'আমার জন্যে অপেক্ষা করছে। এই হল তার কার্ড। সাহেবপাড়ার ফ্ল্যাটে বসে আমার সঙ্গে গল্প করতে চাইছে। এই তো সাড়ে সাতটার সময়। আর বেশি দেরি নেই। তোমরা কি এখনই চলে যাচ্ছ!'

শাশুড়ি মুখে হাত চাপা দিল, 'সর্বনাশ। ও খুকি!'

দেবলীনা বলল, 'আমাকে আমার ব্যাপারটা ভাবতে দাও তো—।'

শাশুড়ি বললেন, 'তুই বুঝতে পারছিস না—। বন্যা রায় তো মেয়েছেলের নাম।'

'হোক না। ও গল্পগুজব অবধি। তা সেটা যে করবে তার স্টকও তো নেই।'

'কিন্তু আগুন আর ঘি এক হয়ে গেলে—?'

'হবে না। বন্যা-টন্যা ছিটকে পালিয়ে যাবে একবার নাকডাকার আওয়াজ পেলে। গত চারবছর রাত্রে ঘুমাতে পারছি না আমি, তবু সহ্য করে আছি। ওই মরসুমি মেয়েরা সেটা করবে কেন? যাও, যাও তুমি তোমার বন্যার কাছে।'

'আগে তুমি যাও। তারপর—!' নাক ডাকার কথাটা শোনার পর ব্রজগোপাল একটু একটু করে মিইয়ে যাচ্ছিল। সে দ্রুত নিজের ঘরে চলে এল। ঘরে নীল আলো জ্বলছে এর মধ্যেই। আকাশে চাঁদ উঠে গেছে সাত তাড়াতাড়ি। ব্রজগোপাল গ্রিলের সামনে দাঁড়াল। ঘুমঘুম চাঁদ ঝিকিমিকি তারা—। অথচ তার জীবন এখন সাহারা।

শব্দ হল। দেবলীনা ঘরে এল, 'মা চলে গেছেন।'

'তুমি গেলে না?'

'না। চার বছরে অভ্যেস হয়ে গেছে। তোমাকে ছেড়ে গেলে ভোর রাতেও ঘুম আসবে না। সারারাত জেগে থাকতে পারব না।'

'কেন?'

'নাক ডাকার শব্দ শুনতে শুনতে আমার নার্ভগুলো টিউন্‌ড হয়ে গেছে যে।' দেবলীনা হাসল, 'মদ খাবে না?'

'না।'

'সিগারেট?'

'না।' ব্রজগোপাল মাথা নাড়ল, 'ওসব খেতে চাইলে বন্যা রায়ের কাছে যেতে পারতাম। অতীশ আজই পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল।'

'তাই বল। সেই অতীশ যে একের পর এক প্রেম করে যাচ্ছে। যাওনি কেন?'

'ইচ্ছে হল না তাই।'

'তা নয়। তুমি জানো বন্যা রায় অতীশের প্রাক্তন প্রেমিকা। তাই মন সাড়া দেয়নি। তা যাবে না যখন তখন ওসব কিনে আনলে কেন?'

ব্রজগোপাল তাকাল, 'ঠিক আছে খাবো দাও। কোথায় ওগুলো?'

পাঁচ মিনিটের মধ্যে নিজেই বোতল থেকে মদ ঢেলে সিগারেট ধরাল ব্রজগোপাল। তারপর বলল, 'জিজ্ঞাসা করতে হয় তাই করছি, তুমি খাবে?'

'অসম্ভব। গন্ধেই বমি পাচ্ছে।'

'তাহলে আনতে বললে কেন?' সিগারেটের ধোঁয়ায় কাশি এল ব্রজগোপালের।

'বলিনি তো। মদ সিগারেট খেতে পারো, কিন্তু উত্তমকুমারের মতো হাসতে হবে।'

'অসম্ভব।' সে সিগারেট নেভাল। ঘরে অ্যাসট্রে নেই। কাগজে চেপে নেভাল। তারপর গ্লাসে চুমুক দিতে গিয়ে থমকে গেল ব্রজগোপাল, 'থাক।'

'থাকছে কেন?'

'তোমাকে আমি ভালবাসি দেবী।'

'সেটা জানি।'

'জানো? তা হলে?'

'আমি তো বলিনি তুমি ভালবাস না। শুধু আমার ভালবাসা আসছে না।'

'এখনও নয়?'

'উঁহু।'

সব ছেড়ে পাশে উঠে এল ব্রজগোপাল, 'তবে মায়ের সঙ্গে চলে গেলে না কেন?

'যদি কখনও ভালবাসা আসে তাই—।'

নীল আলো নিভিয়ে অন্ধকার ঘরে জানলা দিয়ে ঢোকা চাঁদের আলোয় ওরা দু'জন বসে রইল। অপেক্ষায়। ভালবাসা কখন আসবে বলা যায় না। নীরবে যদি চলে আসে তা হলে খপ করে ধরবে ব্রজগোপাল, তারপর দেবলীনার কাছে রেখে দেবে, যদ্দিন পারে।

শান্তিনিকেতনের বাড়ি

শ্রাদ্ধ-শান্তি চুকে যাওয়ার পর মেয়ে বলল, 'মা, এবার তো যেতে হবে।' ছেলে বলল, 'আমি এত করে বাবাকে বলেছিলাম তোমাদের দু'জনের পাসপোর্ট করিয়ে রাখতে, রাখলে আজ তোমাকে আমার সঙ্গে নিয়ে যেতে পারতাম।'

মেয়ে বলল, 'কী হলে কী হত তা ভেবে কী লাভ? এখন চিন্তা কর দাদা, মা এখানে একা কী করে থাকবে? দিল্লিতে গিয়ে তো বেশি দিন থাকতে পারবে না মা। আমি যদি চাকরি করতাম তাহলে এক কথা ছিল—!'

ছেলে বলল, 'পাসপোর্টের এ্যাপ্লিকেশন করলে মাস তিনেকের মধ্যে পেয়ে যাওয়ার কথা। তারপর না হয় আমার কাছে নিয়ে যাব।'

ছেলেমেয়েদের কথা চুপচাপ শুনছিলেন বন্দনা। মাত্র ষোল দিন আগে তাঁর স্বামী অরুণকুমার ঘোষ রাত্রে বিছানায় শুয়ে সকালে আর ওঠেননি। একই ঘরে পাশের খাটে শুয়েও বন্দনা ব্যাপারটা টের পাননি। পঁয়ষট্টি বছরের লোকটার সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক কি রকম ছিল? উত্তরটা এক কথায় বলতে গেলে বলতে হয়, 'ছিল তো'। কিন্তু আচমকা চলে যাওয়ার পর বন্দনা বুঝতে পারছেন শূন্যতা কাকে বলে।

মায়ের যাতে কোনও অসুবিধে না হয় তার খোঁজ খবর নিয়ে ছেলেমেয়েরা যখন ফিরে যাচ্ছিল তখন বন্দনা জিজ্ঞাসা করলেন, 'শান্তিনিকেতনের বাড়িটার কি হবে?'

ছেলে বলল, 'ও হ্যাঁ। বাবা লিখেছিল বটে। ভেবেছিলাম এখানে এলে কয়েকদিন ওখানে গিয়ে থাকব। তা এলাম যে কারণে। বাড়িটা কী রকম?'

মেয়ে বলল, 'পাঁচ কাঠা জমির ওপর দোতলা বাড়ি। খুব সুন্দর। বাবা নিজের পছন্দ মতো করেছিল। ইচ্ছে ছিল শেষ বয়সে ওখানে গিয়ে থাকার। হল না।'

'কী রকম ভ্যালুয়েশন হবে?' ছেলে জিজ্ঞাসা করল।

'কত আর হবে, সাত আট লাখ।' মেয়ে জবাব দিল।

'তাহলে বিক্রি করে দাও। তোমার পক্ষে তো শান্তিনিকেতনের বাড়িতে গিয়ে থাকা সম্ভব নয়। অসুখ হলে রাতবিরেতে ডাক্তার পাবে না। আমার পক্ষেও দু'বছর পর দু-এক রাতের বেশ থাকা অসম্ভব। বাড়ি ব্যবহার না করলে নষ্ট হয়ে যায়। তাছাড়া খালি বাড়ি যে কেউ দখল করে নিতে পারে। তার চেয়ে বিক্রি করে টাকাটা ব্যাঙ্কে রাখলে সুদের টাকায় তোমার দিব্যি চলে যাবে।' ছেলে বলেছিল

মাকে।

ছেলেমেয়েরা চলে যাওয়ার পর ফার্ন রোডের এই ফ্ল্যাট একদম ফাঁকা। সেই কোন প্রাচীনকালে ভাড়া নেওয়া বলে বন্দনার ভাড়া দিতে কোন অসুবিধে হবে না। তাছাড়া ডাক্তারখানা থেকে মিষ্টির দোকান, বাজারহাট সবই ওঁর ভাল চেনা। কাজের মেয়েটিও অনেক দিনের, বিশ্বাসীও। এই বয়সে এখানে থাকতে কোন অসুবিধে নেই। তাছাড়া নিরূপ আছে। ডাক্তার। একটা খবর পেলেই মাসীমা বলে ছুটে আসবে।

অরুণকুমার ঘোষ তেমন অর্থবান মানুষ ছিলেন না কিন্তু হই-চই করতে ভালবাসতেন। বন্ধুদের সঙ্গে শান্তিনিকেতন বেড়াতে গিয়েছিলেন বছর দশেক আগে। ফিরে এসে বলেছিলেন, 'এই শোন, পাঁচ কাঠা জমি কিনে ফেললাম।'

'জমি? কোথায়?' বন্দনা অবাক।

'শান্তিনিকেতনে। খালটা পেরিয়ে প্রান্তিকের দিতে যাওয়ার রাস্তায় বাঁ দিকে। পাঁচ হাজার করে রাজি করিয়েছি। ওখানে ধীরে সুস্থে বাড়ি বানিয়ে শেষ জীবন কাটাব আমরা। খুব ডেভলপ করছে ওদিকটা।' মুখে আলো ফুটেছিল যেন।

তারপর প্রতি সপ্তাহে শান্তিনিকেতনে ছুটে যাওয়া, বাড়ি তৈরির সব ঝামেলা সহ্য করে শেষ পর্যন্ত গৃহ প্রবেশ। বন্দনা বাড়ি তৈরির সময় কয়েকবার গিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ এবং শান্তিনিকেতন এমত ভাবনা এক সময় তাঁকেও আক্রমণ করে। পরিচিতদের কাছে শান্তিনিকেতনে বাড়ি আছে বলতে প্রথম প্রথম ভাল লাগত। তারপর সেই বাড়িতে থাকতে দেবার অনুরোধে পাগল হবার জোগাড়। অরুণকুমার বলে দিয়েছিলেন, পৌষমেলা এবং দোলের সময় কাউকে বাড়ি দেওয়া যাবে না। এতে অনেকেই ক্ষুণ্ণ হত। কিন্তু অন্য সময় কয়েকদিনের জন্যে বেড়াতে গিয়ে বাড়ির যে হাল পরিচিতরা করে আসত তা দেখে দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়ত বন্দনার। অরুণকুমার বলতেন, 'শোন, এবার থেকে কাউকে ও বাড়িতে থাকতে দেব না। শান্তিনিকেতনের বাড়ি আমাদের।'

সেইসব উজ্জ্বল দিনের কথা আজ নতুন করে মনে পড়ল বন্দনার। এবং মনে পড়া মাত্র বন্দনা স্থির করলেন ছেলেমেয়ের কথা তিনি শুনবেন না। শান্তিনিকেতনের বাড়ি বিক্রি করার সিদ্ধান্ত তিনি নেবেন না। অরুণকুমারের স্মৃতি বাঁচিয়ে রাখতে শেষ চেষ্টা করবেন তিনি। ওরা আজকালকার ছেলেমেয়ে, এক কথায় অতীত মুছে দিতে চায়। তিনি পারবেন না।

শান্তিনিকেতন এক্সপ্রেসে বোলপুরে নামলেন বন্দনা। সঙ্গে কাজের মেয়েটিকে নিয়ে এসেছেন। স্টেশনের বাইরে থেকে রিক্সায় চড়তেই স্মৃতিগুলো ঝাঁপিয়ে

পড়ল। প্রথম প্রথম স্বামীর সঙ্গে রিক্সায় যেতেন তিনি, শেষের দিকে গাড়ি ভাড়া করতেন অরুণকুমার।

বোলপুরের বাজার এলাকা পার হবার সময় ভিড়ের কারণে বিরক্ত হচ্ছিলেন, কিন্তু তারপরই একটু একটু করে মন প্রসন্ন হয়ে উঠল। কাজের মেয়েটি এর আগেও তাঁদের সঙ্গে এসেছিল, সে বলল, 'ওই মাঠে মেলা হয়, না মা?'

'হুঁ।' বন্দনা পূর্বপল্লী রতনপল্লী শামবাটি ডিঙিয়ে রিক্সাটাকে খালের দিকে চলে আসতে দেখলেন। এইসব রাস্তায় এক সময় কত হেঁটেছেন ওরা। বন্দনা একটু উদ্বেগে ছিলেন। যে রিক্সাওয়ালাকে বাড়ি দেখাশোনার ভার অরুণকুমার দিয়েছিলেন তাকে চিঠি দেওয়া সত্ত্বেও আজ স্টেশনে আসে নি সে। লোকটাকে বিশ্বাস করে বাইরের ঘরের একটা চাবি পর্যন্ত দিয়েছেন অরুণকুমার। ওপরের ঘর দুটো তালাবন্ধ, নীচেরগুলো মাঝে মাঝে পরিষ্কার করে রাখবে, পাশের বাড়ির আউট হাউসে লোকটা থাকে পরিবার নিয়ে। রিক্সাওয়ালার বউ রান্না করে দেয়।

বাড়ির সামনে রিক্সা থেকে নেমে দেখলেন দরজা খোলা। কয়েকটা বাচ্চা সেখানে চেঁচামেচি করে খেলছে। ওঁকে দেখে বাচ্চাগুলো থিতিয়ে গেল। বাড়ির গেটে কোনও নাম নেই। অরুণকুমার স্ত্রীর নামে বাড়ির নামকরণ করতে চেয়েছিলেন, বন্দনা রাজি হননি।

ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে মাথা গরম হয়ে গেল তাঁর। সমস্ত ঘরে বাচ্চাদের সস্তা খেলার সামগ্রী ছড়ানো। চেয়ারে টেবিলে ছোট ছোট পায়ের ছাপ স্পষ্ট। ঘরটার বারোটা বাজিয়ে ছেড়ে দিয়েছে এরা। এভাবে ব্যবহার করার জন্য চাবি দেওয়া হয়নি। বাচ্চাগুলো তাঁকে দেখে বিন্দুমাত্র ভয় পেল না। এই সময় রিক্সাওয়ালা এল।

'আরে আপনি! আসার কথা জানালে আমি রিক্সা নিয়ে স্টেশনে যেতাম।'

'আমার চিঠি পাওনি?'

'আজ্ঞে না। তবে বাবুর খবর পেয়েছি। আহা, দেবতার মতো মানুষ ছিলেন। আমাকে বলেছিলেন, যতদিন এই বাড়ি থাকবে ততদিন তুমি দেখাশোনা করবে বঙ্কিম।'

'এই দরজা খুলে রেখেছ কেন? বাচ্চাগুলো একেবারে নরক করে ফেলেছে।'

'একদম চিন্তা করবেন না, এখনই সব ঠিক করে দিচ্ছি। আপনি আসছেন জানতে পারলে তো এসব দেখতে পেতেন না। তবে মা, দরজা খোলা রাখতে হয়। ব্যবহার না করলে বাড়ির প্রাণ কমে যায়।'

সারাটা দুপুর গোছগাছ করতেই কেটে গেল। সন্ধেবেলায় এক ফালি চাঁদ

উঠতেই বারান্দায় এসে বসেছিলেন বন্দনা। সব ঠিক আছে, শুধু যে মানুষ এ বাড়ির স্বপ্ন দেখেছিল সে আজ কোথাও নেই। কিন্তু আজ বাড়ি ঠিকঠাক করার সময় থেকে অন্য একটা অনুভূতি হচ্ছে বন্দনার। শোওয়ার ঘর, বারান্দা, বারান্দা থেকে দেখা দূরের মাঠ— এসব কেমন মায়ায় জড়িয়ে ধরছে তাকে। গান ভালবাসতেন অথচ গাইতে জানতেন না অরুণকুমার। আলমারি পরিষ্কার করার সময় গীতবিতানটা দেখতে পেয়ে মনে পড়ল, অরুণকুমার গানগুলো আবৃত্তি করতেন। সঙ্গে সঙ্গে এক অদ্ভুত রোমাঞ্চ হত। বইটি দু'হাতে তুলে নিয়েছিলেন তিনি। এই যে সামনে গাছপালা দাঁড়িয়ে আছে, এর সবই অরুণকুমারের নিজের হাতে লাগানো। এখন বেশ বড়সড় হয়ে হাওয়ায় দুলছে। এ বাড়ির সর্বত্র সেই মৃত মানুষটি জড়িয়ে আছেন। মায়ায় বিদ্ধ হলেন বন্দনা।

কাল রাত্রে ভাল ঘুম হয়নি। রিক্সাওয়ালার বউ নয়, কাজের মেয়েটি আজ রান্নাবান্নার দায়িত্ব নিল। দুটি প্রাণীর রান্না, এমন কি ঝামেলা। তবু সকাল গড়িয়ে দুপুর চলে এল। বন্দনা ইতিমধ্যে পরিকল্পনা করে নিয়েছেন। মাসে অন্তত পনেরো দিন শান্তিনিকেতনের এই বাড়িতে এসে থাকবেন। পনেরো দিন কলকাতায়। যতদিন হাঁটাচলা করতে পারবেন ততদিন এইভাবে চলুক। অবশ্য গ্রীষ্মকালে এখানে থাকা মুশকিল হবে। তাই বা কেন, সে সময় কি এখানে মানুষজন থাকে না? সারাটা দুপুর বাড়ির এঘর ওঘর বাগানে ঘুরে বেড়ালেন বন্দনা। যত ঘোরেন তত মায়া বাড়ে। আর আশ্চর্য, আজ রিক্সাওয়ালার বাচ্চাগুলো এবাড়িতে হুল্লোড় করছে না। তাদের ভিড় পাশের বাড়িতে। সেটার দেখাশোনার দায়িত্ব ওই লোকটার।

ছেলে নিউইয়র্ক থেকে আর কখনও ফিরবে না। মেয়ের বাড়ি হয়েছে দিল্লিতে। তার পক্ষেও শান্তিনিকেতনে এসে থাকা সম্ভব নয়। অথচ এসব নিয়ে কখনও ভাবেননি অরুণকুমার। যার ইচ্ছেতেই এই বাড়ি, সে চলে গেল। কিন্তু তিনি থাকবেন।

বিকেল পড়তেই রিক্সাওয়ালা এল, 'কাল থেকে বাড়িতেই বসে আছেন মা, চলুন আপনাকে ঘুরিয়ে নিয়ে আসি।'

'কোথায় আর যাব!' বন্দনা এড়াতে চাইলেন।

'যেখানে খুশি। প্রান্তিক স্টেশন, আমার কুঠি, শ্রীনিকেতন, ডিয়ার পার্ক। গোয়ালপাড়ায় একটা সিনেমার স্যুটিং হচ্ছে।'

'দুর।'

'তাহলে এমনি এমনি ঘুরে আসুন।'

কাজের মেয়েটি বলল, 'যাও না মা, এত করে বলছে।'

তখন রতন সেনের কথা মনে পড়ল। অরুণকুমার দাদা বলতেন, পূর্ব পল্লীতে থাকতেন। পাঠভবনের সঙ্গে যুক্ত ছিলন দীর্ঘকাল। খুব হাসিখুশি দিলদরিয়া মানুষ। বিয়ে থা করেননি। ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা করে এলে হয়।

রিক্সায় চেপে কোঅপারেটিভের মাঠ পর্যন্ত আসতে মন্দ লাগল না। তারপরই বাঁ দিকে যেতে বললেন রিক্সাওয়ালাকে। এই রাস্তায় প্রায়ই অল্পবয়সী ছেলে মেয়েকে হয় সাইকেলে, নয় হেঁটে যাওয়া আসা করতে দেখেছেন তিনি, আজও দেখলেন। নিশ্চয়ই এখানকার ছাত্রছাত্রী। দেখলে ভাল লাগে।

একটু বাদেই চোখে পড়ল। বাঁ এবং ডানদিকে একটার পর একটা বাড়ি পড়ে আছে তালাবন্দী হয়ে। বাগানে আগাছা, শুকনো পাতার ভিড় বারান্দায়, প্যাসেজে। দেখেই বোঝা যায় বাড়িতে কেউ থাকে না। প্রায় প্রতিটি গেটে সুন্দর সুন্দর নামের বাহার। বেশির ভাগই রবীন্দ্রনাথ থেকে নেওয়া।

রিক্সাওয়ালা বলল, 'এসব এক পুরুষের বাড়ি মা। কর্তা শখ করে বানিয়েছিল, তা তিনি চলে যেতেই এদিকে আর কেউ মাড়ায় না।'

'কেউ আসে না?' বুকের ভেতরটা কী রকম করছিল বন্দনার।'

'আসে। ওই পৌষমেলার সময় চড়ুইভাতি করতে আসে কয়েক দিনের জন্যে।'

'বিক্রি করে দিক না।'

'কিনবে কে?'

'মানে?'

'এসব বাড়ি তো পুরনো কালের। এখন যারা বাড়ি বানায় তারা অনেক কায়দা করে। যাতে দেখতে ভাল লাগে আবার সুবিধে হয়। এই যে বাড়িটা দেখছেন, এই বাড়িটায় মালিক মারা যাওয়ার পর কেউ আসেনি গত কুড়ি বছর। হরিনাথদা দেখাশোনা করত। এখন তো বাড়িটার তারই হয়ে গেছে।'

'হরিনাথদা কে?'

'রিক্সা চালাত। বাড়ির ট্যাক্সও সে-ই দেয়।'

'এতো জবর দখল!' বলেই রিক্সাওয়ালার পেছন দিকটা দেখলেন বন্দনা। ওর এই বাসনা আছে নিশ্চয়ই।

'তা কেন? যদ্দিন কেউ আসবে না তদ্দিন হরিনাথদারা দেখাশোনা করে যাবে। কুড়ি বছর হয়ে গিয়েছে, আরও কুড়ি চল্লিশ ষাট বছর। তা যা বলছিলাম, নতুন যারা বাড়ি বানাতে আসে তারা নিজের মনের মতো বাড়ি চায়। পুরনো কালের বাড়ি কিনবে কেন? এখন এসব বাড়ি ছেড়ে শুধু জমিটাই বিক্রি হবে মা।'

বন্দনার বুকের ভেতরটা খাঁ খাঁ করছিল। এতসব বাড়ি শূন্য পড়ে আছে? ছেলেমেয়েরা হয়তো এখানে আসার প্রয়োজনই বোধ করে না। হঠাৎ চোখে পড়ল একটি একতলার বারান্দায় দু'জন বসে আছেন। দু'জনেই রোগা এবং বয়সের ভারে নুইয়ে পড়ার উপক্রম। দেখে ভাল লাগল। নিশ্চয়ই স্বামী-স্ত্রী, এঁরা তো দিব্যি আছেন।

আরও খানিকটা ঘোরাঘুরির পর ফিরে আসা। রিক্সা চলছে। সেই বুড়োবুড়ির বাড়ির সামনে পৌঁছানো মাত্র বন্দনা রিক্সা থামাতে বললেন। তারপর গেট খুলে ভেতরে ঢুকলেন। এক পলকেই দেখে নিলেন ছোট্ট বাগানে হাত পড়েনি অনেকদিন। বৃদ্ধা উঠে দাঁড়ালেন, 'কিছু বলবেন?'

'আজ্ঞে না। আমাদের একটা বাড়ি আছে প্রান্তিকে। আজ এদিক দিয়ে বেড়াতে যাওয়ার সময় আপনাদের দেখে আলাপ করার ইচ্ছে হল, তাই।'

'অ। প্রান্তিক। ওসবদিকে শুনেছি কলকাতার উঠতি বড়লোকরা খুব বাড়ি বানাচ্ছে। সারাজীবন তো খোয়াই দেখে এসেছি ওদিকে। আসল শান্তিনিকেতন কিন্তু শামবাটিতেই শেষ হয়ে গিয়েছে।' বৃদ্ধা বললেন।

'ওঁকে বসতে বল। অতিথি।' বৃদ্ধ গম্ভীর গলায় বললেন।'

'না-না-আমি-।' আপত্তি করলেন বন্দনা।

'আমার স্বামী। রবীন্দ্রনাথ ওঁকে খুবই স্নেহ করতেন।'

'আঃ। ওসব কথা কেন? আজকাল বুড়ো হলে সবাই দাবি করে রবীন্দ্রনাথ আমাকে এই করতেন, তাই করতেন কাঁধে হাত রাখতেন। বোগাস।'

'আপনারা এ বাড়িতে অনেকদিন আছেন?'

'হ্যাঁ। কোথায় এসেছিলেন?' বৃদ্ধা জানতে চাইলেন।

তখন রতন সেনের কথা মনে পড়ল। এসে ফিরে যাচ্ছেন অথচ যাঁর কাছে আসা তাঁর বাড়িতে যাওয়ার কথা মনেই নেই। আশ্চর্য! তিনি রতন সেনের নাম বললেন।

'উনি তো এখন কলকাতায়। ব্লাড ক্যানসার হয়েছে বলে শুনেছি।' বৃদ্ধা বললেন। চমকে উঠলেন বন্দনা, 'সেকি!'

'ভাল লোক ছিলেন। আমাদের খোঁজ খবর নিতেন রোজ।'

মন খারাপ হয়ে গেল বন্দনার। কোথাও একটা ভাল খবর নেই।'

বৃদ্ধ জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনারা কি মরসুমের পাখি নাকি আমাদের মতো?'

'না, খুব কম আসা হয়।'

'আমাদের যাওয়ার জায়গা নেই তাই এখানেই পড়ে আছি।' বৃদ্ধ বললেন,

'আর সবাই—?'

'আমরা নিঃসন্তান।'

'ও।' বন্দনা বললেন, 'আচ্ছা, আমি আসি।'

বৃদ্ধা এক পা এগিয়ে এলেন, 'আপনারা এখানে কদ্দিন আছেন?'

'ঠিক করিনি।'

'আপনার স্বামী?'

'নেই। কিছুদিন আগে চলে গেছেন।'

হঠাৎ বৃদ্ধা আঁচল চেপে ধরলেন মুখে মুঠোয় নিয়ে। ওঁর শরীর থরথর করে কাঁপছিল। বন্দনা বিব্রত হয়ে এগিয়ে এলেন, 'কী হয়েছে আপনার? শরীর খারাপ।' বৃদ্ধা সেই অবস্থায় মাথা নেড়ে না বললেন।

বৃদ্ধ ততক্ষণে উঠে দাঁড়িয়েছেন চেয়ার ছেড়ে, 'সত্যবতী, শক্ত হও। সত্যবতী।' বৃদ্ধা কান্না গিলছিলেন, 'আমার ভয় করছে। মাগো।'

বৃদ্ধ বললেন, 'মাপ করবেন' কেউ মারা গেছে শুনলে আজকাল ওর এরকম হয়। চারধারের মানুষ এত মারা যাচ্ছে অথবা মরতে চলেছে যে ও সহ্য করতে পারে না। কেবলই নিজের কথা ভাবে।' বৃদ্ধ এগিয়ে এসে বৃদ্ধার কাঁধে হাত রাখলেন।

বন্দনা অবাক হল, 'নিজের কথা?'

'হ্যাঁ। আমি চলে গেলে এই বাড়িতে ও একা থাকবে কী করে? আমাদের লোকজন নেই, অর্থবল নেই, জীবনে সঞ্চয়ও নেই। এসব বিক্রি করতে পারি না রবীন্দ্রনাথের জন্যে, বিক্রি করে কোথাও যাওয়ার মতো শরীরে বল নেই। কিন্তু আমি ওকে বলি ও-ই আগে যাবে। আমার আগে। কিন্তু—।'

রিক্সায় উঠে বসলেন বন্দনা। রিক্সা ছুটছিল। সন্ধে হয়ে আসছে। হঠাৎ সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললেন তিনি। মায়ার বাড়ি বিক্রি করে দেবেন। যা দাম পান তাতেই। সেই টাকায় পনেরো দিন কলকাতায় পনেরো দিন এখানে ওখানে সেখানে ঘুরে ঘুরে বেড়াবেন যদ্দিন শরীর পারে। শেকড় নামালে দুশ্চিন্তা বাড়ে। তারচেয়ে ভেসে ভেসে থাকা ঢের ভাল। এক জায়গায় পড়ে থেকে একই দৃশ্য রোজ দেখার বদলে নতুন নতুন পটভূমি দেখে বেড়ানো ঢের ভাল।

এই করতে করতে জীবন ফুরিয়ে গেলে নিজের মতো চলে যাওয়া যাবে। ওরা অন্তত নিউইয়র্ক অথবা দিল্লি থেকে বেজায় মুখে শান্তিনিকেতনে এসে বাড়ি ঘর বিক্রি করতে বাধ্য হবে না। মনে মনে ভাববে না, মা এই দায়টা চাপিয়ে দিয়ে গেল। এক পুরুষের বাড়ি এক পুরুষেই মুক্ত হয়ে যাক।

নিজের ছবি

শ্মশানে গিয়েছিল নবীন। যেহেতু শখ করে যারা শ্মশানে যায়, তাদের দলে সে পড়ে না, তাই যাওয়ার পেছনে একটা কারণ ছিল। বিকেলবেলায় সে যখন একটা কেসে অনেক রিলিফ দেবার কারণে অফিসে বসেছিল পার্টির কাছ থেকে খাম আসবে বলে, সেই সময় টেলিফোন এল। তার শ্বশুর মশাই মারা গিয়েছিল। দুপুরবেলায় খবর পাওয়া মাত্র স্ত্রী বাপের বাড়ি চলে গিয়েছে। নবীনের অফিসের লাইন পেতে দেরি হচ্ছিল। একটু পরেই শ্বশুর মশাইকে শ্মশানে নিয়ে যাওয়া হবে।

বেশ হকচকিয়ে গিয়েছিল প্রথমে। তারপর কি রকম একটা সমস্ত মন জুড়িয়ে দিল। শ্বশুর মশাই-এর ভয়ে তাকে কাঁটা হয়ে থাকতে হত সব সময়। লোকটা যা নয় তাই হয়েছে এমন ভান করত। এই কলকাতা শহরের সমস্ত ক্ষমতাবান ব্যক্তি ওর পরিচিত। পুলিশ, মন্ত্রী, রাজনৈতিক নেতা থেকে মাস্তান কে নয়? এই সব কথা নবীনের স্ত্রী নবীনকে গর্ব করে বলত। তার বাবা খুব রাগী, পান থেকে চূন খসলে কুরুক্ষেত্র করেন। এরপরে নবীন ভয়ে ভয়ে থাকত যাতে কোনমতে স্ত্রীর সঙ্গে ঝগড়া না হয়ে যায়। স্ত্রীকে তোয়াজ করে চলতে চলতে সে স্ত্রৈণ হয়ে পড়েছিল। সেই শ্বশুর পটল তুলেছে শুনলে কোন জামাই-এর না আনন্দ হয়। এটা অফিস না হলে সে ধেই ধেই করে নাচত। এখন তার কি করণীয়? দেরি করে খবর দিয়েছে যখন, দেরি করে গেলে দোষ কি? বিশেষ করে খামটার জন্য তাকে অপেক্ষা করতেই হবে।

নবীনের সেকশনের সবাই এখন চাতকের মত অপেক্ষা করে আছে। পিওন থেকে ক্লার্ক পর্যন্ত সবাই জানে ওই খামে মোটা টাকা আছে। যার যেমন পদমর্যাদা সেই মত ভাগ হবে। অফিসার এদের মধ্যে পড়ে না। তিনি তারটা আগেই নিয়ে নিয়েছেন। আজ দুপুরে নবীনকে ডেকে বলেছেন— অর্ডারটা ইস্যু করেছো?

—হ্যাঁ স্যার, মানে আজকেই করা হবে।

—গুড। আমি ওদের বলে দিয়েছি, আপনাদের দেখবার জন্য।

কি ভাল অফিসার। একা একা খায় না। সবাইকে পাইয়ে দেয়। কিন্তু তার শ্বশুর শ্মশানে যাচ্ছে বলে সে তো চেয়ার ছেড়ে উঠতে পারে না। পার্টির লোক খাম নিয়ে এসে যদি দ্যাখে সে নেই, তাহলে এটা ফিরিয়ে নিয়ে যাবে। অগত্যা

আরও এক ঘন্টা বসতে হল, পার্টির লোক এল। খাম ও আটটা একশো টাকার নোট। টেবিলের মধ্যে হাত ঢুকিয়ে চারটে নোট নিজে নিয়ে বাকিটা সহকারিকে দিল স্ট্যাটাস মত বিতরণ করে দিতে। তারপর কাঁধের নীচে রাখা কলার বাঁচানো রুমালটা টেনে মুখ মুছতে মুছতে সে দৌড়তে লাগল। এটাকে ঘুষ বলা ঠিক নয়। টিপস্। চায়ের দোকানে গিয়ে বেয়ারাকে চার আনা আট আনা বখশিস্ দিলে তো অন্যায় হয় না। তেমনি কাজটা করে দিচ্ছি বলে ওরা আমাদের বখশিস্ দেয়। সাহেবকে অবশ্য ঘুষ দেয়। কারণ সাহেব ওদের অনেক বে-আইনী ব্যাপার চোখ বন্ধ করে উপেক্ষা করেন। তাই সাহেবের বেলায় যেটা ঘুষ, তাদের বেলায় সেটা টিপস্।

আজ বাড়িতে গিয়ে লাভ নেই। তার চেয়ে ফুলের মালা নিয়ে শ্মশানেই অপেক্ষা করা ভাল। ভাল মালা কিনল নবীন। তারপর ট্যাকসিতে উঠে বলল— শ্মশানে চলুন ভাই। জলদি।

—কোন শ্মশান?

—এ্যাঁ? গোলমালে পড়ল সে। কোন শ্মশানে নিয়ে যাচ্ছে জিজ্ঞাসা করেনি সে। দর্জিপাড়ায় থাকে যখন তখন নিমতলায় যাওয়াই স্বাভাবিক। সমস্ত কলকাতা ডিঙিয়ে কেওড়াতলায় নিশ্চয়ই যাবেনা। অতএব সে ট্যাকসিওয়ালাকে নিমতলায় যেতে বলল। বলে ফুলের মালাটিকে সামান্য তফাতে সরিয়ে রাখল।

টিপসের টাকা থেকে ফুল এবং ট্যাকসি ভাড়ার টাকা বেরিয়ে গেল। এ সব খরচ আগে থেকে জানান দিয়ে আসে না, যে মাসের শেষে খরচার লিস্টে ঢোকানো থাকবে। ভাগ্যিস্ সময় মত টিপসের টাকা এসে গেল।

নবীন টিপস্ বললেও ওর সহকর্মী গোবিন্দ সেটা মানতে নারাজ— 'যাই বলুন দাদা, টিপস্ শব্দটার মধ্যে একটু দাক্ষিণ্য ভাব আছে। পার্টিরা আমাদের কাছে এসে কুঁকড়ে থাকে, দয়া করার সাহস পাবে কোথায়? এটাকে যদি আপনি ও, সি বলেন তাহলে ভাল হয়। ও, সি মানে আদার ইনকাম।'

দু'দিনের যোগী ভাতকে কয় অন্ন। নবীন যখন ঢুকেছিল, তখন কাজ মন দিয়ে শিখতে হত।

ল', বাই-ল' একাউন্টস্ ইত্যাদি জানতে হত। অফিসার ভুল করলে তাকে শুধরে দেওয়া কর্তব্য ছিল। আর যে লোক কাজ জানে তাকে সবাই খাতির করবেই। পার্টিরাও হাতে রাখত। আর এখনকার ছেলেরা এসেই ইউনিয়নের মেম্বার হয়ে যায়। কাজের ব্যাপারে লবডংকা। এমন কি কেস ফিক্স্ করার দিন জানিয়ে দেওয়ার জন্যও পয়সা চায়। এই যে তাকে শ্বশুর মারা যাওয়ার খবর পাওয়ার পর খামের জন্য অপেক্ষা করতে হল, তার কারণ তো ভয়ানক। গতকাল

অফিসে এসে হাতে পেতে অনেক বলা সত্ত্বেও পার্টি বেশি দিতে রাজি হয়নি। অর্থাৎ আজ যা পাওয়া গেল, তার অর্ধেক। ভেরিফিকেশনের উপায় নেই। সহকর্মীদের ছোট করা হবে। অতএব চুপচাপ মেনে নাও। একটু দেরি হলেও পুরো মালটা তো হাতে এল। .

বি.কে. পাল দিয়ে গিয়ে ট্যাকসি আটকে গেল। সামনে লরির স্তব্ধ মিছিল। এক পা-ও এগিয়ে যাওয়ার উপায় নেই। অগত্যা ফুল নিয়ে নেমে ভাড়া মিটিয়ে দিল সে। এসব রাস্তায় হাঁটা মানে ধাক্কা খেয়ে এগুনো। ওই করতে করতে নিমতলায় পৌঁছে সে দেখল, কলকাতাকে পরিষ্কার রাখার আবেদন জানিয়ে একটি বড় নোটিশ বোর্ড টানিয়েছে কর্পোরেশন। দেখে ভালো লাগল। একটি ধর্মপ্রাণ মাড়োয়ারির মৃতদেহ আসায় শবের ক্রিয়াকর্ম আর'ও বেড়ে গিয়েছে।

গোঁতাগুঁতি করে ভিতরে ঢুকে অবাক হল নবীন। শ্বশুর মশাই কোথাও শুয়ে নেই। সেই সঙ্গে ওদের কোন আত্মীয়কেও দেখতে পেল না। স্ত্রীর দেখা পাওয়া যাবেই, তিনি কোথায়?

নিমতলায় সব আছে। মৃতদেহ, টাউট, শোকগ্রস্ত চা খাইয়েদের ভিড়, শুধু শ্বশুর মশাই এবং তার আত্মীয়স্বজন নেই। এখন এই ফুলের মালা নিয়ে কোথায় যাবে সে? যাবে মানে যেতেই হবে। শ্বশুর মারা গেছে, এ তার মুক্তির আনন্দ।

—দাদা, ডেডবডি পাচ্ছেন না বুঝি?

—আজ্ঞে?

—মালাটা আর কি করবেন? আমাদের বডিতে পরিয়ে দিন! ও পাশে শায়িত একটি মৃতদেহ দেখিয়ে দিল যুবক। নবীন মৃতদেহটি দেখল। একটি শুঁটকো বুড়ো। দেখেই মনে হয় আমাশয়ে ভুগত। নবীন মালা হাতে দ্রুত বেরিয়ে এল। হঠাৎ তার খেয়াল হল— এদিকে আর একটা ঘাট আছে। কাশী মিত্তিরের ঘাট। সেখানেও সংকার হয় যখন, তখন শ্বশুর মশাইকে ওরা ওখানেই নিয়ে যেতে পারে। একটা রিক্সায় উঠল সে। সন্ধেবেলায় গঙ্গার পাশ দিয়ে রিক্সায় যেতে দেখা গেল মন্দ লাগেনা। নবীন শিস্ দিয়ে শ্যামল মিত্রেব 'যদি ডাকো ওপার হতে' গাইতে লাগল। এককালে সে শ্যামলের গান ভালই গাইত। এখন যে সব ইতিহাস।

কাশী মিত্তির ছোট ঘাট। সেখানেও শ্বশুর মশাই নেই। এবং তখনই সন্দেহ হল, ফোনটা ফল্‌স্ নয়তো! নাঃ বড় শালার গলা শুনেছে সে। বাপ মারা যাওয়ায় গলাটা ঈষৎ কাঁদো-কাঁদো ছিল। দিদিকে ফাঁকি দিয়ে সম্পত্তি হাতাতে হলে এমন ধারাটি কাঁদতে তো হবেই।

· তা হলে? ওদিকে কাশীপুরে শ্মশান আছে। তার মাথায় বুদ্ধি এল। সে একটা

এস, টি, ডি বুথে ঢুকে ফোন করল।

—হ্যালো! শাশুড়ির গলা।

—আজ্ঞে আমি নবীন—সে কি বলবে ভেবে পাচ্ছিল না।

—ও নবীন!

—হ্যা—মানে ওরা কোথায়?

—তোমার কি কখনও আক্কেল হবে না বাবা? ছি, ছি, ছি। একটু আগে সুধা শ্মশান থেকে ফোন করেছিল। তুমি নাকি অফিস থেকেও বেরিয়ে গেছ অনেক আগে। তা বাবা—

—আজ্ঞে কোন শ্মশান? কথা শেষ করতে দিল না সে।

—কেওড়াতলা। ওর খুব বাসনা ছিল ওখানে যাওয়ার। আমি বাবা বলেছি, আমাকে নিমতলায় নিয়ে যেতে। কেওড়াতলার গঙ্গা কি গঙ্গা?

টেলিফোন নামিয়ে রেখে পাগলের মত ট্যাকসি খুঁজল সে। পেল না। এই সময় চোখে তার চক্র রেল পড়ল। তখনই আসা একটা ট্রেনে উঠে বসল সে। বাঃ মন্দ না তো! যেন মনে হচ্ছে পুরনো কলকাতা দর্শন হচ্ছে।

আউটরাম ঘাট থেকে ট্যাকসি নিয়ে সে যখন শ্মশানে পৌঁছলো, তখন শেষ রাত। ইলেকট্রিক চুল্লির সামনে তখন হরিবোল চলছে।

বড়-ছোট শালার সঙ্গে সমান তালে গলা মেলাচ্ছে তার স্ত্রী। আত্মীয় স্বজনরা ভিড় করে আছে। আর বাঁশের বাখারির উপর শুয়ে আছেন প্রবল প্রতাপান্বিত নবীনের শ্বশুর মশাই। মুখের ভাব দ্যাখো। যেন গিলে খাবেন। নবীন এগিয়ে গিয়ে ফুলের মালা গলায় দেবার চেষ্টা করতেই সেটা মুখ ঢেকে ফেলল। সঙ্গে সঙ্গে স্ত্রীর চিৎকার কানে এল— ও কি সরাও সরাও। মুখ চেনা যাচ্ছে না যে।

ছোট শালা সরিয়ে দিল। সময় হয়ে গিয়েছিল। শব্দ করে লোহার পাত ওপরে তোলা হতেই চুল্লি। গেট খুলে গেল। বাখারি এবং ফুলের মালা সমেত শ্বশুর মশাই গনগনে আগুনের মধ্যে ঢুকে গেলেন। চারধার নিস্তব্ধ। খুব খারাপ লাগছিল নবীনের। এই তো পরিণতি। তুমি যেই হও না কেন, তোমাকে চুল্লিতে ঢুকিয়ে দেওয়া হবেই। স্ত্রী এগিয়ে এল— এতক্ষণ কোথায় ছিলে? গলায় হিস্ হিস্ শব্দ।

—গুলিয়ে ফেলেছিলাম। নিমতলা, কাশীপুর—

—ওঃ। এতদিনেও আমার বাবাকে চিনলে না। লোক যা সহজে করে, তা তিনি করতেন না। পকেটে টাকা-কড়ি আছে?

—আছে।

—দাও। বাবার শেষ কাজের খরচ আমিই করতে চাই। জোর করে মুখাগ্নি দিয়েছি, জানো! পুরুত চাইছিল বড় ছেলে করুক। আমি আপত্তি করেছি। এসো আমার সঙ্গে। স্ত্রী হন হনিয়ে হাঁটতে থাকল। শ্মশানের অফিসের লোক দুটো কাগজ লিখে দিয়ে বলল—দিদি, আমরা একটু পেয়ে থাকি। মানে সবাই দেয়। এই যে কাগজ লিখলাম এতে যদি ভুল থাকে, তাহলে মৃতের সম্পত্তি পাওয়া অসম্ভব হয়ে যাবে। হেঁ-হেঁ।

স্ত্রী বলল, —দশটা টাকা দিয়ে দাও।

—না দিদি। দশে কি হয় বলুন।

—কুড়ি টাকা টিপস্ দাও।

বাধ্য হয়ে কুড়ি টাকা দিয়ে দিল নবীন। টিপস্ শব্দটা কানে লাগল। ইলেকট্রিক চুল্লির পাশে একটি ঘর থেকে অন্যত্র কাগজ পাওয়া গেল যাদের হাত থেকে, তারা বলল—আপনাদের এখন মনের অবস্থা খারাপ জানি। কিন্তু চা জলখাবার বাবদ পঞ্চাশটা টাকা না চেয়েও পারছি না। দিয়ে দিন।

স্ত্রী বলল—কুড়িটা টাকা দাও!

ওরা বলল— সে কি, কুড়ি?

স্ত্রী বলল এইই ঢের। নিলে নিন— নাহলে চলে যাচ্ছি।

শ্বশুর মোটা মানুষ ছিলেন। শরীরে জল ছিল। পুড়তে সময় লাগল। পোড়া শেষ হয়ে গেলে ডাক এল অস্থি নিয়ে যাওয়ার জন্য। স্ত্রী বলল— চলো আমার সঙ্গে। নিচের ঘরে একটা লোহার ট্রের মধ্যে ছাই হয়ে আসা লালছে হাড় কয়েকটা হল শ্বশুর মশাই-এর শেষ অবস্থা। পৃথিবীর যে কোন মানুষ পুড়ে যাওয়ার পর ট্রেতে ওই অবস্থায় পৌঁছে যায়। চিমটে দিয়ে খোঁচাখুঁচি করে একটুকুরো ছোট হাড় বের করে সরায় তুলে দিয়ে লোকটা বলল—দু'শো টাকা বখশিস্ দিন।

স্ত্রী চিৎকার করল— ইল্লি আর কি। আমার বাপকে পুড়িয়ে তার অস্থি আমার হাতে তুলে দিয়ে আবার আমার কাছেই ঘুষ চাওয়া হচ্ছে! কেন, এই কাজের জন্য মাইনে পাও না? এ্যাই কি দেখছো? কুড়িটা টাকা ওকে দিয়ে বাবাকে ধরো।

আদেশ পালন করে সরায় অস্থি নিয়ে গঙ্গার দিকে নবীন এগিয়ে যাচ্ছিল। তার পাশে স্ত্রী, শালারা এবং আত্মীয় স্বজন। শ্বশুর এক সময়ে ওর ডিপার্টমেন্টে কাজ করতেন। সেই সূত্রে সম্বন্ধ। লোকটা ঘুষ নিত দু'হাতে। আজ এখন কুড়ি টাকা ঘুষ দিয়ে পাওয়া তার অস্থি। ওর জন্য কেউ কাঁদছে না। না শাশুড়ি, না তার মেয়ে। হঠাৎ নবীনের মনে হল, শ্বশুড় নয়, তার অস্থি চলেছে গঙ্গাপ্রাপ্ত হতে। সেও নিশ্চিত তারও এই দশা হবে।

পুলিশের নাম বসন্ত

ট্রামবাস চলতে শুরু করে দেয় দুটো নাগাদ, ওই সময় আর কেউই রঙ ছোঁড়ে না। তবু অহনা ইতস্তত করেছিল, 'কালকের দিনটা ছেড়ে দাও।'

স্বপ্নময় বলেছিল, 'ইম্পসিবল। আগামীকাল বছরের সবচেয়ে বড় চাঁদ উঠবে আর একসঙ্গে দেখব না? তুমি এ রকম ভাবতে পারছ?

অহনা স্বপ্নময়ের মুখের দিকে তাকাল। তার মনে হল এত আর্তি সে আর কারও মুখে দেখেনি। তবু তার গলায় নরম সুর বাজল, 'আমার না ভীষণ ভয় করে। রঙ দেওয়া-নেওয়া আমি কোনওদিন করিনি। সারা সকাল দুপুর দরজা বন্ধ করে গান শুনি।'

'সেটা দুপুর পর্যন্ত শুনে বিকেল-বিকেল বেরিয়ে এসো।'

'কিন্তু মা-বাবা কি ভাববে?'

'তার মানে? তুমি কচি খুকি নাকি? তা ছাড়া নটার মধ্যেই তো ফিরে যাচ্ছ!'

'তুমি বুঝতে পারছ না যে আমি রঙের দিন ঘরের বাইরে বের হই না। সেই আমি বিকেলবেলায় বেরুচ্ছি, ওঁরা বিশ্বাসই করতে পারবে না।'

'বিশ্বাস করাও। মোটের ওপর কালকের চাঁদ আমরা একসঙ্গে দেখব।'

অহনা ফিরে গিয়েছিল কিন্তু-কিন্তু মুখ নিয়ে। স্বপ্নময়ের বাড়িতেও দোল খেলার তেমন চল নেই। বাবা-মায়ের বন্ধুরা অবশ্য গাড়ি চালিয়ে আসে। একটু-আধটু আবির ছুঁড়ে তাস খেলতে বসে যায়। সঙ্গে থাকে বিয়ার আর ভদকা। সুভদ্রার মা মাছভাজা সাপ্লাই দেয়। বাবার বন্ধুদের স্ত্রীরা তো বটেই, এই দিন মায়ের হাতেও গ্লাস দেখেছে সে। এ বছর বাবাই তাকে ডাকল, 'স্বপ্ন, এ দিকে এস।'

বিছানায় শুয়ে বব ডিলানের ক্যাসেট শুনছিল সে। অহনা তাকে দিয়েছে। সুমনের গানের ধরন ও কিছু কথাবার্তা যে বব ডিলান থেকে নেওয়া সেটা বুঝে উত্তেজিত হচ্ছিল সে। সুমন তার প্রিয় গায়ক। হোক না নেওয়া, রবীন্দ্রনাথও তো নিয়েছেন। আসলে অন্যের জিনিস নিয়ে নিজের মতো পরিবেশন করতে হিম্মত লাগে।

বাইরে ঘরের দরজায় এসে দাঁড়াল সে। এখন সকাল সাড়ে দশটা। কার্পেটে বাবু হয়ে বসে চেপে খেলা হচ্ছিল। তাকে দেখতে পেয়ে মা গ্লাস নামিয়ে রাখল। এদের প্রায় সবাইকে সে ছেলেবেলা থেকে দেখে আসছে। যে দু'জনকে দেখেনি তাদের একজন মাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কে ভাই? দেওর না ভাই?'

মায়ের মুখ লাল হয়েই ছিল। বলল, 'ধ্যাৎ। আমার ছেলে। স্বপ্নময়।'

বাবা ডাকলেন, 'স্বপ্নময় এসো। সবাইকে হ্যালো বল।' এই ব্যাপারটা সেই জ্ঞান হবার পর থেকেই বাবা চালিয়ে আসছে। বাড়িতে কেউ এলেই তার ডাক পড়ে 'হ্যালো' বলার জন্যে। আজ সে বলল,'আপনারা ভাল আছেন?'

ডার্বিকাকা, ভদ্রলোকের নাম ডার্বি দাশগুপ্ত, বললেন, 'আছি হে। তা তুমি যে ঘরবন্দী হয়ে আছ। যাও, রঙটঙ খেলো। কলেজে পড়ছ তো?'

'পার্ট টু দেব।'

'তবে? এখনও দু-এক পিস গার্লফ্রেন্ড হয়নি?'

সঙ্গে সঙ্গে মায়ের আপত্তি শোনা গেল, 'ডার্বিদা, আমার ছেলের মাথাটা খাবেন না।'

সবার হাসি থামলে বাবা একটা গ্লাসে ভদকার সঙ্গে লিমকা মিশিয়ে এগিয়ে ধরলেন, 'নাও। খাও। এককালে বাঙ্গালি আজকের দিনে ভাঙ-এর সরবৎ খেত। টেস্ট করো।'

'আমার ঠিক ভাল লাগে না।'

ডার্বিকাকা বললেন, 'আরে না খেলে বুঝবে কি করে ওটা ভাল না মন্দ? তোমরা কি রকম লাকি বলতো? বাবা নিজের হাতে ভদকার গ্লাস তুলে দিচ্ছে! আমাদের বাবারা দৃশ্যটা ভাবতেও পারতেন না।'

বাবা বললেন, 'এটা তো খারাপ কিছু নয়। সিগারেট মদ আজ বাদে কাল ও নিজেই খাবে। আমি শুধু বলব নেশার গলায় লাগাম না পরাতে পারলে কখনও নেশা করো না।'

স্বপ্নময় বলল, 'আমি আসছি।'

বাবা মাথা নাড়তেই সে বেরিয়ে গেল। ফ্ল্যাটটা বড়। কোণের ঘর স্বপ্নময়ের। একটা ছোট্ট ব্যালকনিও রয়েছে। সে ব্যালকনিতে গিয়ে নিচের দিকে তাকাল। রাস্তায় জোর হোলি খেলা চলছে। এরই মধ্যে কিছু মানুষ প্রায় ভূত সেজে

হল্লা করছে। তাদের মুখ চকচকে রঙ, ভঙ্গি সিনেমায় দেখা আফ্রিকার ক্যানিবালদেরও হার মানায়। কয়েকটি মেয়েকেও মাথায় পট্টি বেঁধে রঙিন হয়ে যেতে দেখল সে। এই যে রঙের জন্যে একবেলার উল্লাস, দূর থেকে দেখতেও ভাল লাগে না স্বপ্নময়ের। সে মুখ তুলল। পাশের ফ্ল্যাটের ব্যালকনিতে মুন্নি দাড়িঁয়েছিল। চোখাচোখি হতে করুণ হাসল, 'ওদের কি মজা, না স্বপ্নদা?'

'তোমার রঙ খেলতে ইচ্ছে করছে?'

'খু-উ-ব। কিন্তু কার সঙ্গে খেলব? মা বলেছে নিচে নামা চলবে না।'

মুন্নির বয়স বড়জোর আট। স্বপ্নময় হেসে বলল, 'বাবা-মায়ের সঙ্গে খেলো।'

'বাবা তো নেই। আজ হোলি বলে বন্ধুদের সঙ্গে দীঘায় চলে গিয়েছেন গতকাল। এই, তুমি আমার সঙ্গে রঙ খেলবে?' মুন্নির মুখের চেহারা বদলে গেল।

'আমার যে রঙ খেলতে ভাল লাগে না।'

'খেল না। প্লিজ, আমার জন্যে খেল। শুধু আবির। আর কিছু না।'

'আবির কোথায় পাব।?'

'আছে। বাবা কিনেছিল দীঘায় নিয়ে যাবে বলে। আমি তা থেকে খানিকটা রেখে দিয়েছি। ও স্বপ্নদা, এসো না, প্লিজ।'

'শুধু কপালে কিন্তু—।'

'ঠিক আছে বাবা। মা, মা, স্বপ্নদা আসছে রঙ খেলতে।' মুন্নি ছুটে গেল ভেতরে। স্বপ্নময় আড়ষ্ট হল। তার যেটা করার বিন্দুমাত্র ইচ্ছে নেই সেটাই করতে হবে? বাচ্চা মেয়েটা ওইভাবে বলতে তার মুখ ফসকে— ! যাক গে, একটা শিশু যদি আনন্দ পায়, পাক। সে বাইরের ঘরে আসতেই মা জিজ্ঞাসা করল, 'কি রে?'

'পাশের ফ্ল্যাটে যাচ্ছি।' গম্ভীর গলায় বলল স্বপ্নময়।

'কেন ?'

'মুন্নি ডাকছে।' দরজা খুলে বেরিয়ে এল সে। দরজা বন্ধ করতেই ও পাশের দরজা খুলে গেল। মুন্নি দাঁড়িয়ে আছে, 'কি মজা। এসো।'

সিঁড়িতে কেউ নেই। ওদের ফ্ল্যাটে ঢুকে দরজা ভেজিয়ে স্বপ্নময় জিজ্ঞাসা করল, 'কোথায়, আবির দাও।'

এই সময় মুন্নির মা বেরিয়ে এলেন, 'কি ব্যাপার স্বপ্নময়? তুমি।' ভদ্রমহিলার মুখে মিষ্টি হাসি। মহিলা সুন্দরী। এ পাড়ায় এত সুন্দর ফিগার কারও নেই।

স্বপ্নময়ের না জানা কোনও কারণে মা ওঁকে পছন্দ করেন না। মুন্নির মাও অন্য কোনও ফ্ল্যাটে যাওয়া-আসা করেন না।

'মুন্নি বলল রঙ খেলার সঙ্গী পাচ্ছে না—।'

'ও তাই বল, ব্যালকনি থেকে বলেছে। আমাকে তো সকাল থেকে পঁচিশবার বলল। আচ্ছা, তুমিই বলো, আমি ওর সঙ্গে কি রঙ খেলবো?' প্রশ্ন শেষ হওয়ামাত্র হাসি বাজল।

ইতিমধ্যে মুন্নি আবিরের প্যাকেট নিয়ে এসেছে। তার মা চোখ পাকালো, 'নো। এখানে নয়। ঘর নোংরা হবে। ব্যালকনিতে যাও মুন্নি।'

মুন্নি স্বপ্নময়কে ডাকল, 'এসো।'

ব্যালকনিতে দাঁড়াতেই নিচ থেকে চিৎকার ভেসে এল, 'হোলি হ্যায়।'

এটা বেশ অদ্ভুত ব্যাপার। বাঙালি নিজের অজান্তেই হিন্দি বলে। 'হোলি হ্যায়', 'দুর্গা মাঈকি জয়'। হিন্দি না বললে আবেগ জোরদার হয় না।

হঠাৎ মুন্নির গলায় 'হোলি হ্যায়' চিৎকার বাজল, এবং স্বপ্নময় মুখচোখে আবিরের আঘাত পেল। যথাসময়ে চোখের পাতা বন্ধ করতে পেরেছিল বলে রক্ষে। আর সেই সুযোগ নিয়ে মুন্নি মুঠো মুঠো আবির তার গায়ে ছড়িয়ে দিচ্ছে। স্বপ্নময় অন্ধের মতো হাত বাড়াল, 'মুন্নি, আমার হাতে কোনও আবির নেই, আমায় দাও, নইলে তোমাকে মাখাবো কি করে?'

মুন্নি এক চিমটি আবির স্বপ্নময়ের বাড়ানো হাতে দিতেই তার মা হেসে উঠলেন, 'ইস, কি কিপ্টে। আরও খানিকটা দে।'

'বেশি দিলে যে শেষ হয়ে যাবে।'

'হোক।'

মুন্নি আর একটু পরিমাণ বাড়াতে স্বপ্নময় তাকে টেনে নিয়ে আলতো করে মুখে কপালে মাখিয়ে দিল। যখন সে রঙ মাখাচ্ছে তখন মুন্নি স্থির। চোখ, বন্ধ, মুখে তৃপ্তির ছাপ, ঠোঁটে হাসি। তারপরই সে ঘুরে দাঁড়াল, 'মা, তুমি নিচু হও।'

সঙ্গে সঙ্গে মহিলা হরিণের মতো ছুটে গেলেন, 'না বাবা, আমি না।' মুন্নি তাকে অনুসরণ করল। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল স্বপ্নময়। পাশের ঘরে হুটোপুটি চলছে। তারপর মুন্নি বেরিয়ে এল,'নেই, সব শেষ। কি হবে'?

'বেশ তো, খেলা হল।' স্বপ্নময় ওর মাথায় হাত রাখল।

'এই টুকুনি? জানো, বাবা না এত্তো এত্তো রঙ নিয়ে গিয়েছে। কত খেলবে। তোমাদের বাড়িতে আবির নেই?'

'না। আচ্ছা, এখন আমি চলি।'

বাইরের ঘরে পা বাড়াতেই মুন্নির মা এলেন, 'দেখো তো কি কাণ্ড!'

ভদ্রমহিলাকে এখন অদ্ভুত দেখাচ্ছে। ওঁর গায়ের চামড়ার সঙ্গে ছোপ ছোপ আবির আলাদা ছবি তৈরি করেছে। ভদ্রমহিলা বললেন, 'তুমি চলে যাচ্ছ?'

'হ্যাঁ। আর তো আবির নেই।'

'আর নেই না! ওহো কিছু খাবে না? এই দিন রঙ খেললে কিছু খেতে হয়।'

'না, না। এখন কিছু খাব না।' দরজা খুলে বেরিয়ে এল সে। এবং তখনই একটা হইহই আওয়াজ কানে এল। সে কিছু বোঝার আগেই কারা যেন ঝাঁপিয়ে পড়ল তার ওপরে। দু'জন তাকে জাপটে ধরেছে, দু'জন মুখে কপালে গলায় রঙ বোলাচ্ছে। সে প্রতিবাদ করার সময় পেল না। ছেলেদের একজন খোলা দরজায় দাঁড়াল,'বউদি, একটু রঙ?'

মুন্নির মায়ের আপত্তি কানে এল, 'না ভাই। আমার ও সব.......।'

'ওই তো মেখেছেন। স্বপ্নময় মাখাতে পারে আমরা পারব না কেন? শুধু আবির।'

'ওহো! ঠিক আছে, শুধু কপালে কিন্তু—।'

সঙ্গে সঙ্গে উল্লাস বাজল। স্বপ্নময় সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে চোখ খুলল। মুন্নির মাকে জড়িয়ে ধরে রঙ মাখাচ্ছে ছেলেটি। কপালে গলার চৌহদ্দি ছাড়িয়ে নিচে নেমে গেল হাত। ভদ্রমহিলা দু'হাতে মুখ ঢাকলেন। ছেলের দল নেমে গেল হইহই করতে করতে। স্বপ্নময় হাত বাড়িয়ে দরজা টেনে দিয়ে আড়াল আনল। কোন মহিলার বুকে রঙ মাখাবার নাম করে হাত দিলে তিনি চুপ করে থাকবেন কেন? সে নিজের ফ্ল্যাটের বেল টিপিল।

মা দরজা খুলল,'কে, কাকে চাই?'

'আমি । সরো।' ভেতরে পা বাড়াল স্বপ্নময়।

'এম্মা! তোর কি চেহারা হয়েছে। দেখো দেখো তোমার পুত্রের কাণ্ড দেখো। কোনও দিন যে রঙ খেলেনি সে এবার ভূত সেজে এল, আমি চিনতেই পারিনি।'

ডার্বিকাকুর জড়ানো গলা বলল, 'মা জিজ্ঞাসা করছে ছেলেকে, কে? ভাবা যায়!'

স্বপ্নময় ভেতরে চলে এল। এখানে দাঁড়িয়ে কিছু বললে সেটা মা-বাবার গায়ে লাগত। এরা দিনদুপুরে জুয়ো খেলতে খেলতে মদ খেয়ে যা ইচ্ছে তাই বলার অধিকার পাবে বলে ধরে নিয়েছে।

বাবার সঙ্গে মায়ের চমৎকার বন্ধুত্ব। জ্ঞান হবার পর থেকে ওদের মধ্যে ঝগড়াঝাঁটি হতে দেখেনি স্বপ্নময়। বাবার বন্ধুরা বলে এমন আন্ডারস্ট্যান্ডিং; তারা কল্পনাও করে না। এরা যেন ঠিকঠাক, 'মেড ফর ইচ আদার' পেয়ার। অথচ ছুটির দিনে বা কোনও পার্টি হলে যাঁরা এ বাড়িতে আসেন তাঁদের নিজেদের সম্পর্ক নিয়ে যে গোলমাল তা মিটিয়ে দিতে মাকে সক্রিয় হতে দেখা যায়। বাবার চেয়ে বয়সে একটু ছোট, বড় কোম্পানির বড় অফিসার হিল্লোল বোস অনেকটা মদ্যপানের পর গত মাসে চিৎকার করেছিল, 'ওকে বলে দিন, রুমাল পাল্টাবার মতো বয়ফ্রেন্ড যেন না পাল্টায়। এতে আমার খুব অসুবিধে হয়। আমি যেমন একজনের সঙ্গে স্টেডি আছি ও তাই করুক, নো প্রবলেম। ডিভোর্স সেপারেশন চলবে না, শান্তিপূর্ণ সহবস্থান মেনে নেব। প্রমিশ!'

পাশের ঘরে বসেও কথাগুলো কানে এসেছিল স্বপ্নময়ের। সঙ্গে সঙ্গে মায়ের গলা বেজেছিল, 'প্লিজ হিল্লোল! তুমি নিয়ম ভাঙছ। মদ খাবে কিন্তু মাতলামি করবে না, তোমরা সবাই স্থির করেছিলে। তাই না?'

'ইয়েস ম্যাডাম। আমি মাতাল নই।'

'তোমার গলা পাশের ঘরে আমার ছেলের কানেও পৌঁছে যাচ্ছে!'

'দেন, আই অ্যাম সরি। আমি চুপ করলাম।'

আবার সব শান্ত হয়ে গেল।

বাবা-মা এবং তাদের বন্ধুদের জীবনযাপন এখন বঙ্গদেশের শিক্ষিত সমাজে ব্যতিক্রম নয়। স্বপ্নময়ের অনেক বন্ধুদের বাবা-মা এবং তাদের বন্ধুরা এই একই জীবন যাপন করে। সোম থেকে বৃহস্পতিবার অফিস অথবা ব্যবসা। প্রচণ্ড সিরিয়াস লোক তখন সবাই। কিন্তু শুক্রবার এবং শনিবার সন্ধে থেকে মধ্যরাত পর্যন্ত একসঙ্গে জড়ো হয়ে মদ্যপান এবং খাবার খাওয়া প্রায় নিয়মের মতো হয়ে দাঁড়িয়েছে। বড়দের সমালোচনা করা তার কাজ নয়। তা ছাড়া মা-বাবা তার সঙ্গে কখনই অন্যায় ব্যবহার করে না। বাবা তো বলেই দিয়েছে, 'তুমি এখন বড় হয়েছ। ভালমন্দ বিচার করার ক্ষমতা হয়েছে। নিজে যা ভাল মনে করবে করো আমার

আপত্তি নেই।'

বাথরুমের আয়নায় নিজেকে দেখে হেসে ফেলল স্বপ্নময়। এই মুখ যে তার তা ভাবাই যাচ্ছে না। মা যে প্রথমে চিনতে পারেনি তাতে অবাক হবার কিছু নেই। অহনা যদি এই মুখ দেখতে পেত! মুখে রঙ লাগালে চরিত্র বদলে যায়। অদ্ভুত! কিন্তু সেই রঙ তুলতে গিয়ে যখন মুখের চামড়া জ্বলতে লাগল, লাল হয়ে গেল তখন স্বপ্নময়ের মনে হল ওই ছেলেগুলো প্রতিবছর এত কষ্ট হবে জেনেও মুখে বাঁদুরে রঙ মাখে কেন?

একসময় সবাই একান্নবর্তী ছিল। এখন যা হয় তাই হলেও সম্পর্ক নষ্ট হয়নি। পালাপার্বণে এ বাড়ি ও বাড়িতে সবাই জড়ো হয়। আজ যেমন সকাল হতে না-হতেই এসে হাজির। ছেলেরা ধুতি পাঞ্জাবি, মেয়েরা বাসন্তী রঙের শাড়ি। এ পাড়ায় আটটার আগে রাস্তায় রঙ খেলা হয় না। অহনার বাবার উৎসাহে যারা পেরেছে তার আগেই পৌঁছে গিয়েছে। গাড়িওয়ালা এসেছে একটু দেরি করে। অহনাদের বাড়িটা পুরনো ধাঁচের। মাঝখানে অনেকটা বড় বাঁধানো চাতাল, চারপাশে উঁচু বারান্দা। ওই চাতালে শতরঞ্চি পেতে বসেছে সবাই। সঙ্গে হারমোনিয়াম, তবলা। বেগুনি আবির প্রত্যেকের কপালে। রবীন্দ্রনাথের বসন্তের গান গলায় গলায়। দশটা নাগাদ যখন আসর জমজমাট তখন কারও খেয়াল হল, অহনা সেখানে নেই।

'ও জেঠিমা, অহনা কোথায়? সে এল না কেন?'

অহনার মা খোঁপায় ঘোমটা ঠিক রেখে বললেন, 'ভীতুর ডিম। ঘরের দরজা বন্ধ করে টেপ চালিয়ে গান শুনছে। রঙে তার ভীষণ ভয়।'

দু-চারজন হইহই করে উঠল। এ কেমন কথা? আমরা সব ঝুঁকি নিয়ে এত দূরে এলাম আর বাড়ির মেয়ে ঘরের দরজা আটকে বসে থাকবে? ছুটল তারা। মেয়েরাই সংখ্যায় ভারী। মিনিট চারেকের মধ্যে টানতে টানতে নিয়ে এল বিধ্বস্ত অহনাকে। তখন তার পরনে অবশ্য বাসন্তী রঙেরই শাড়ি। আসরের মধ্যেখানে বসিয়ে দেওয়া হল তাকে। কেউ একজন আবিরের টিপ পরিয়ে দিতে গেলে সে মুখ ঢাকল দু'হাতে।

অহনার বাবা বললেন, 'ঠিক আছে ঠিক আছে। তুই বরং একটা গান গা মা।'

অহনা আঙুলের আড়াল কিছুতেই সরায় না, গান গাইবে কি? তখন আশ্বাস দেওয়া হল, গান শোনালে মুক্তি পাবে। তবে যে সে গান নয়, ' আজ সবার রঙে রঙ মিশাতে হবে।'

শেষ পর্যন্ত মুখ নিচু করে হারমোনিয়ামে হাত রাখল অহনা। প্রথম দিকে গলায় ঈষৎ কাঁপন, ক্রমশ সেটা স্থির। সকলে মুগ্ধ হয়ে শুনল। গান থামতেই এক আত্মীয় ওকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরে বললেন, 'কি গুণী মেয়েরে তুই। যা গাইলি তা যদি বিশ্বাস নাই করিস তা হলে গানটা এমন সুন্দর হল কি করে?' বলামাত্র আবির ঝরাল অহনার চুলে-মুখে-গলায়।

প্রায় কেঁদে ফেলেছিল অহনা। কিন্তু সামলে নিতে পারল। শুধু মুখে বলল, 'তোমরা কথা রাখনি।'

ও পাশ থেকে এক মামাতো দাদা বলে উঠল, 'কেউ কথা রাখে না।'

'সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়। কবিতাটা হয়ে যাক।' আর একজন মন্তব্য করল।

দাদাটি উঁচিয়ে ছিল। তার আবৃত্তির গলা বেশ ভাল, ফাংশনে ডাক পড়ে। কিন্তু সে মাথা নাড়ল, 'উঁহু। অহনা আর একটা গান না শোনালে আমি কিছুই করব না।'

'গা, গা অহনা। প্লিজ।'

মাথা ঝাঁকাল অহনা, 'আমার কিছুই মনে পড়ছে না।'

দাদাটি বলল, 'বেশি গাইতে হবে না। "দু'জনের কানাকানি কথা—"।

'এম্মা। ওই ভাবে মাঝখান থেকে গাওয়া যায় নাকি?' অহনা অবাক।

অহনার মা বললেন, 'এ আবার কি রকম গান?'

'যে গাইবে সে বুঝেছে।'

অহনা মাথা নাড়ল, 'তা ছাড়া ওটা তো রাতের বেলার গান।'

'অন্ধের কিবা দিন কিবা রাত। আজ রঙের নেশায় আমরা অন্ধ।' দাদাটি বলল।

বাবা বললেন, 'এ তো ছোঁড়া দেখছি বেশ পক্ক হয়েছে। তাই গা—।'

'দু'জনের কানাকানি কথা দু'জনের মিলনবিহ্বলতা, জ্যোৎস্নাধারায় যায় ভেসে যায় দোলের পূর্ণিমাতে।' অহনার চোখ বন্ধ। হঠাৎ সে চোখের সামনে স্বপ্নময়কে দেখতে পেল। স্বপ্নময় বলেছিল আজ রাত্রে আমরা একসঙ্গে চাঁদ দেখব। সঙ্গে -সঙ্গে তার নিজের কাছেই নিজের গলা অচেনা মনে হল। 'তোমরা অলস দ্বিপ্রহরে'

বলার সময় সে যেন স্বপ্নময়কে ছুঁতে পারল। অথচ এ গান ছোঁয়ার নয়। এ গান ছোঁয়ার বাসনা রেখে যাওয়ার। গান শেষ হতেই লক্ষ পায়রা ডানা মেলল। সবাই হাততালি দিচ্ছে। এমন কি বাবাও। হাত বাড়িয়ে তিনি অহনার চিবুক ধরলেন, 'তুই কি ভাল গাইলি। রাজেশ্বরী দত্তের কথা মনে পড়ে গেল। বাঃ। খুব ভাল।'

মুখে রক্ত জমে গেল অহনার। ভাগ্যিস আবির ছড়ানো ছিল আগেভাগে নইলে ঠিক ধরা পড়ে যেত এদের কাছে।

কবিতা আর গানে দুপুর গড়ালো। আজ খিচুড়ি আর চার রকমের ভাজা। সঙ্গে চাটনি। চেটেপুটে খেল সবাই। বাবা বললেন, 'যদ্দিন বাঁচি তদ্দিন এই আনন্দটুকু করে যাব। যারা সারা বছর ব্যস্ত থাকে, তারা যেন সময় করে সামনের বারও এসো।'

তিনটেয় বাড়ি ফাঁকা। তখন রাস্তায় রঙিন বীরদের দৌরাত্ম্য শেষ। এখন সর্বত্র রঙের দাগ অথচ সেগুলোর কোনও মূল্য নেই।

. অহনা নিজের ঘরে জানলার পাশ বসেছিল। এখনও বাইরে ভালো রোদ, আর কিছুক্ষণ বাদে তাকে বেরুতে হবে। কোনওদিন যা করেনি আজ করলে বাড়িতে কি প্রতিক্রিয়া হবে? স্বপ্নময়টা তাকে এমন বিপদে ফেলে দিল! নামটা মনে আসতেই কি রকম একটা ভাললাগা সমস্ত শরীরে ছড়িয়ে পড়ল। আশ্চর্য, ওর কথা ভাবতেই তার গানের গলা এমন হয়ে গেল যে বাবার রাজেশ্বরী দত্তের কথা মনে পড়ে গিয়েছিল?

গতকালই অহনা ভেবেছিল মাকে বলে রাখবে বেরুবার কথা। কিন্তু বলব বলব করেও ঠিক সাহস হয়নি। সে আকাশের দিকে তাকাল। যেহেতু এ আকাশ বসন্তের তাই কি রকম মায়া মাখানো। সে উঠল। করিডোর পেরিয়ে বাবা-মায়ের ঘরে পৌঁছালো। মা বাঁধানো মাসিক বসুমতী নিয়ে শুয়ে আছেন। এটা মায়ের হবি। কবে মাসিক বসুমতী বন্ধ হয়ে গিয়েছে কিন্তু মায়ের তাতে কোনও আপত্তি নেই। এ বাড়িতে যত মাসিক আসতো সবই বাঁধানো অবস্থায় এর ওর গায়ে হেলান দিয়ে রয়েছে। এমন কি প্রথম সংখ্যা দেশ পত্রিকা থেকেও একটিও বাদ নেই। মা দুপুরে বসুমতীর গল্পগুলো পড়ে। বাবা শুয়ে আছে ও পাশে, মায়ের দিকে পেছন ফিরে। মাঝখানে একটা মোটা পাশবালিশ। ওকে ঢুকতে দেখে মা

ধড়মড়িয়ে উঠে বসল, 'কি রে?'

'আজ বিকেলবেলায় আমি একটু বেরুবো?'

'কোথায়?'

'আমাদের এক অধ্যাপকের বাড়িতে, গানটান হবে—।'

'এই রঙের দিনে বেরুবি? কতদূরে?'

'বেশি দূরে নয়।'

পাশ ফেরা বাবা ওই অবস্থায় বলল, 'অধ্যাপকের নাম ঠিকানা ফোন নম্বর লিখে দিয়ে যাও। আজকের দিনে ছেলেমেয়েরা খুউব হারিয়ে যায়। তেমন হলে পুলিশকে তো বলতে পারব এই ঠিকানায় গিয়েছিল।'

অহনা তীব্র আপত্তি করে উঠেছিল, 'বাবা, তুমি না? ঠিক আছে, আমি কোথাও যাব না।'

মা বলল, 'দামী কিছু পরে যাস না! কে কোত্থেকে রঙ ছুঁড়বে। অধ্যাপকের বাড়ি যখন তখন যা। তবে খবর শুরু হবার আগে ফিরে আসিস।'

অহনা বাধ্য বালিকার মতো ঘাড় নেড়েছিল।

হলুদ শাড়ি, হলুদ জামা, চুরি, হলদে বাঁধন, কপালে হলুদ টিপ, অহনা যখন পথে নামল তখন কলকাতার রোদ্দুর পূর্ব দিগন্তে। একটা গম্ভীর ছায়া ছড়িয়ে যাচ্ছে সর্বত্র। পাড়া থেকে বেরুবার আগে কেউ একজন মন্তব্য করল, 'কেস জন্ডিস!'

গালে রক্ত জমল অহনার, হাঁটার গতি বেড়ে গেল। সে যে আজ হলুদে আছে দেখেই ওই মন্তব্য— ছেলেগুলো দিনরাত রকে বসে থাকে কিন্তু বুদ্ধিসুদ্ধি ভাল। বড় রাস্তার বাসস্ট্যান্ডে এসে দাঁড়াতেই সে দেখতে পেল সবাই সেজেগুজে বেরিয়ে পড়েছে। দোলের বিকেল বলে কেউ ভয় পাচ্ছে না। কিন্তু সবাই তাকে ঘুরে ঘুরে দেখছে। এই দেখাটা বড় অস্বস্তিকর। না হয় সব হলুদ পড়েছে তাই বলে মাথা ঘুরিয়ে দেখার কি আছে!

ধর্মতলার মোড় ছাড়িয়ে রাজভবনের পাশ দিয়ে প্রাইভেট বাসটা যখন আউটরাম ঘাটের দিকে এগোচ্ছে তখনও আলো ছিল। এ সব জায়গায় যতক্ষণ আলো থাকে ততক্ষণ স্বস্তি পাওয়া যায়। কিন্তু এই মরে যাওয়া আলো জানান দিচ্ছে অন্ধকারের। বুক টিপ টিপ করছিল অহনার। টার্মিনালে বাস থামতেই সে

সিরসিরে পায়ে নিচে নামতেই কোথাও স্বপ্নময়কে দেখতে পেল না। অথচ কথা ছিল স্বপ্নময় এইখানে এই সময়ে তার জন্যে দাঁড়িয়ে থাকবে। তা হলে? অহনা ঠিক করল এখানেই দাঁড়িয়ে থাকবে। এই সময় সে নিজের নামটা শুনতে পেল। চমকে মুখ ফেরাতেই রাস্তার ওপাশে দাঁড়ানো স্বপ্নময়কে দেখতে পেল। পর পর গাড়ি ছুটে যাচ্ছে বলে এ দিকে আসতে পারছে না। চিৎকার করে হাত নেড়ে ডাকছে। চিৎকারটা এমন যে সারা পৃথিবী অহনার নাম জেনে গেল।

অহনাকে এগোতে দেখে দাঁড়িয়ে গেল স্বপ্নময়। অহনাই রাস্তা পার হল। আর স্বপ্নময় বলল, 'কী সুন্দর দেখাচ্ছে তোমাকে।'

'দেরি করলে কেন?'

'কোথায় দেরি? আমি দেখলাম তুমি বাস থেকে নামছ। আমাকে খুঁজছ। বেশ নার্ভাস হয়ে পড়লে। রুমালে আঙুল জড়ালে, কি ঠিক কি না?'

'বাঃ, তুমি দূর থেকে দেখছিলে?'

'দেখেই তোমার নাম ধরে ডেকে উঠলাম। অহনা সত্যি, তোমাবে খুউব......।'

'থাক। চল, আমি এভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে পারব না।'

তিন পা হেঁটেই স্বপ্নময় বলল, 'অ্যাই, কি ব্যাপার বল তো?'

'কি?'

'তোমাকে খুব ব্যক্তিত্বময়ী মহিলা বলে মনে হচ্ছে আজ।'

'সেটা খারাপ?'

'খারাপ নয়। তবে আজ দোলের দিনে একটু অসুবিধে হয়।'

'তুমি কি করলে সারা সকাল?'

'একটা বাচ্চা মেয়ে আবিরের বায়না ধরেছিল, তাকে শান্ত করতে গিয়ে অন্যেরা এসে বাঁদুরে রঙ মাখিয়ে দিল। তা মুখ থেকে তুলতে প্রাণ বেরিয়ে গেছে।'

'কই দেখি?'

চিবুক তুলল স্বপ্নময়। অহনা বলল, 'দুর, কিছু লেগে নেই।'

'তুমি বই পড়ে গান-শুনে কাটালে?'

'নাঃ। সব্বাই এমন ধরল যে একটু আবির মাখতে হল।'

ওরা গঙ্গার ধারে চলে এল। সন্ধে নামছে কিন্তু সেটা টের পাওয়া যাচ্ছে না।

ওরা বসার জায়গা খুঁজল। আশ্চর্য, সব জায়গা আগেভাগে দখল করে নিয়েছে পৃথিবীর সব প্রেমিক-প্রেমিকা। এমন কি তিনজোড়া অপরিচিত প্রেমিক প্রেমিকা গাদাগাদি করে গাছের নিচে বসে কি করে নিজেদের কথা বলছে কে জানে!

অনেক হাঁটাহাটির পরও যখন জায়গা পাওয়া গেল না তখন একটি বৃদ্ধ মাঝি তাদের সামনে এসে দাঁড়াল, 'আসুন, এক ঘন্টা, দু' ঘন্টা, তিন ঘন্টা আমার নৌকায় বসে চাঁদ দেখবেন। দোলপূর্ণিমার চাঁদ বলে কথা। এই চাঁদ জলের সঙ্গে সম্পর্ক করে। তাই জলে না বসলে বুঝতে পারবেন না। এখন ঘন্টা পঞ্চাশ টাকা।'

'পঞ্চাশ টাকা। সর্বনাশ। অত টাকা আমার কাছে নেই।'

'দু'জনের যা আছে মিলিয়ে দেখুন না। ছই আছে।'

'ছই-এর মধ্যে বসলে চাঁদ দেখব কি করে?'

বৃদ্ধ হাসল, 'সে আপনাদের যা ইচ্ছে। দেখতে দেখতেও তো বিশ্রাম নিতে ইচ্ছে হয়।'

অহনা এতক্ষণ শুনছিল। এবার মাথা নাড়ল, 'অসম্ভব! আমি জলে নামব না।'

বৃদ্ধ বলল, 'আপনি জলে নামবেন কেন দিদি, আপনি নৌকোয় থাকবেন।'

'নৌকোটা তো জলে ভাসবে।' অহনা আপত্তি করল।

স্বপ্নময় বলল, 'খুব থ্রিল হত কিন্তু। দেখুন, পঞ্চাশ দিতে পারব না—।'

'ঠিক আছে, পরে বিচার-বিবেচনা করে যা হয় দেবেন।' বৃদ্ধ হাসল।

সঙ্গে সঙ্গে হাঁটা আরম্ভ করল অহনা। স্বপ্নময় তার পেছন ছুটে এল, 'কি হল?'

'লোকটির হাসি খুব খারাপ! এখান থেকে চল।'

অনেকটা দূরে চলে আসার পর সিনেমার মতো চাঁদ উঠল। যদিও রাস্তার কিছু আলো তখনও জ্বলছে কিন্তু পৃথিবীটা অন্যরকম হয়ে গেল। স্বপ্নময় বলল, 'আচ্ছা, কিরকম হাসি খারাপ হয়?'

'জানি না। তবে ওই লোকটার হাসি খারাপ।'

'তা হলে আমরা এখন কি করব? কিছু খাবে?'

'কি খাব?'

'এই ধরো ফুচকা, চা বাদাম—।'

'তোমার খিদে পেয়েছে?'

'না। কিছু করতে হবে তো!'

'চল, কোথাও গিয়ে বসি।'

'বসার জায়গা—।' বলতে গিয়ে মনে পড়ে গেল। উদ্ভাসিত হল স্বপ্নময়, 'চল, ওই মাঠটায় বসি। দারুণ ব্যাপার হবে।'

ওরা রাস্তা পার হয়ে আইসক্রিমের গাড়ির পাশ দিয়ে আসবার সময় শুনতে পেল, 'সাব, প্লাস্টিক লাগে গা?'

স্বপ্নময় জিজ্ঞাসা করল, 'প্লাস্টিক?'

লোকটা তার স্টক থেকে একটা বড় প্লাস্টিক শিট্ বের করে দেখাল। স্বপ্নময় ঘাড় নাড়ল, না। লোকটা বলল, 'হ্যাঁ বললে সুবিধে হবে। কেউ আপনাদের বিরক্ত করবে না।'

ওরা লোকটাকে পাত্তা না দিয়ে মাঠের মাঝখানে চলে এল। দূরে গঙ্গার ধারের দোকানগুলোতে আলো জ্বলছে। বিশাল মাঠের ওপর আকাশ উপচানো যে জ্যোস্নার ঢল নেমেছে তার কাছে সেই আলো একেবারেই ম্লান। গোল চাঁদ গম্ভীরভাবে তাকিয়ে আছে তাদের দিকে। স্বপ্নময় অহনার পাশে বলল, 'ফ্যান্টাস্টিক।'

অহনাও মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিল। তার মনে হচ্ছিল এতদিন কত চাঁদ কত পূর্ণিমায় আকাশে আলোর ঝড় তুলেছে কিন্তু আজকের মতো কখনও হয়নি। গত পূর্ণিমাতেও নিশ্চয়ই চাঁদ উঠেছিল কিন্তু তার মনেই নেই। আজকের রাতটা মনে থাকবে কারণ স্বপ্নময় পাশে রয়েছে। সে স্বপ্নময়ের দিকে তাকাল। কিরকম মুগ্ধ চোখে চাঁদ দেখছে, 'অ্যাই!'

স্বপ্নময় মুখ ফেরাল না, 'বল!'

'শুধু চাঁদ দেখতেই এসেছ? কথা বলবে না।'

'ধর আজ যদি আমরা কথা না বলি, শুধু চাঁদ দেখে যাই।'

'আমার ভাল লাগবে না।'

স্বপ্নময় হঠাৎ ফিরে তাকাল, 'তুমি আমাকে কতখানি ভালবাস অহনা?'

অহনা মুখ সরাল, 'জানি না।'

'আমরা একসঙ্গে পড়ি। একসঙ্গে সারাজীবন থাকব?'

'নইলে আজ এখানে আসব কেন?'

'কোনও চাপে আমাকে ছেড়ে যাবে না তো?'

'কক্ষনও না।'

'যদি কখনও আমার ওপর বিরক্ত হও, যদি আমাকে অসহ্য লাগে।'

'আমি জানি না।'

'আমার ভয় লাগে।'

'কেন?'

'ওই যে, বাল্যপ্রেমে অভিশাপ আছে।' স্বপ্নময় বলল।

'তুমি বালক?' হেসে উঠল অহনা।

'আহা তুমি আমার প্রথম প্রেম তো! তা ছাড়া পৃথিবীর সব প্রেম নাকি বিচ্ছেদেই মর্যাদা পেয়েছে। আই কান্ট ড্রিম দ্যাট। এই তোমার হাত দেখি।'

'কেন?'

'একটু ধরব।' স্বপ্নময় হাত বাড়িয়ে অহনার আঙুল স্পর্শ করল। কি ঠাণ্ডা, ঠাণ্ডা এবং ভিজে ভিজে। সে গাঢ় গলায় বলল, 'এই একটা গান গাইবে?'

'—ধ্যাৎ লোকে শুনলে কি বলবে?'

'কেউ কিছু বলবে না। গাও।'

অহনা চোখ বন্ধ করল, 'নিবিড় অমা তিমির হতে বাহির হল জোয়ার-স্রোতে/শুক্লারাতে চাঁদের তরুণী।' লাইনটা দ্বিতীয়বার গাইতেই কয়েকজন পেছনে এসে দাঁড়াল।

'উঠুন।'

অহনা গান থামাল। ততক্ষণে উঠে দাঁড়িয়ে প্রতিবাদ করল স্বপ্নময়, 'মানে? কে আপনারা।'

'পুলিশ। উঠে পড়ুন। ওখানে ভ্যান আছে।'

'আশ্চর্য! এখানে বসা কি অপরাধ?'

'সেটা থানায় গিয়ে জানতে পারবেন?'

'দেখুন, আমরা তো কোনও অন্যায় করিনি। শুধু এখানে বসেছিলাম।'

'আপনাদের সম্পর্ক?'

'আমরা, আমরা বন্ধু।'

'তাই আপনারা দু'জনে আঙুলে আঙুল জড়িয়ে ছিলেন! এই যে ম্যাডাম, উঠে পড়ুন।'

স্বপ্নময়র আপত্তি, অনুরোধে কান না দিয়ে একজন ওর হাত ধরে টানতে টানতে

নিয়ে যাচ্ছিল ভ্যানের দিকে। বাকি দু'জন গরু তাড়ানোর ভঙ্গিতে অহনাকে হাঁটাচ্ছিল। অহনার আশা হচ্ছিল শেষ মুহূর্তে স্বপ্নময় একটা পথ বের করবে। কিন্তু লোকটার পাশে ওকে কি অসহায়, রুগ্ন দেখাচ্ছে। স্বপ্নময়কে ভ্যানে তোলা হলে ইউনির্ফম পরা এক যুবক অফিসার এগিয়ে এল, 'সব ক'টাকে তুলেছ?'

'হ্যাঁ স্যার।' যে লোকটা অহনার পেছনে ছিল সে তাড়া দিল, 'উঠুন, উঠুন।'

অফিসার অহনার দিকে তাকাল। সঙ্গে সঙ্গে মুখের চেহারা পাল্টে গেল তার, 'আরে! তুমি? তুমি এখানে কি করছ?'

চিবুক বুকের ওপর নেমে যাচ্ছিল। অফিসার আবার জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি তো অহনা?'

অহনা মুখ তুলল, 'আমি কিছুই করিনি।'

'আঃ। এখানে সন্ধের পর মাঠে কেউ বসে! কত খারাপ কাজকর্ম হয় এখানে! কলগার্ল আর ভদ্রলোকের মেয়েদের আলাদা করা যায় না। তোমরা প্লাস্টিক শিট নিয়েছিলে?'

সেপাইটি বলল, 'না স্যার।'

'ঠিক আছে। আপাতত ভ্যানে ওঠ।'

উঠতে হল। অহনা দেখল ভ্যানে আরও কয়েকজন ছেলে-মেয়ে নারীপুরুষ রয়েছে। একটি মেয়ে বিড়ি খাচ্ছে। ভ্যান চলল, স্বপ্নময় চুপচাপ মুখে হাত দিয়ে বসে আছে।

কিছুটা যাওয়ার পর ভ্যান থামল। পেছনের দরজা খুলে অফিসার ডাকল, 'অহনা, নেমে এসো। তাড়াতাড়ি।'

অহনা নামল। অফিসার বলল, 'এটা বাস স্ট্যান্ড। এখান থেকে সোজা বাড়ি ফিরে যাও। আমাকে তুমি চিনতে পারছ?'

অহনা কথা বলল না। অফিসার বলল, 'আমার নাম বসন্ত। তোমাদের গলির মোড়েই থাকি। কথা দিচ্ছি এ ব্যাপারটা পাড়ার কেউ জানতে পারবে না। যাও।'

'ও? ' অহনার মুখ থেকে শব্দটা বেরিয়ে এল।

'কি নাম?'

'স্বপ্নময়।'

'বন্ধু, মানে ঘনিষ্ঠ বন্ধু ?'

অহনা জবাব দিল না।

'তুমি বড় হয়েছ। এমন ইম্‌ম্যাচিওর ছেলের সঙ্গে বন্ধুত্ব করা কি মানায় যে তোমাকে খোলা মাঠে নিয়ে এসে বিপদে ফেলে দেবে? ভেবে দেখো।' অফিসার ভ্যানের দিকে মুখ ফেরালো, 'স্বপ্নময় কে? নেমে এসো। কুইক।'

স্বপ্নময় নামল। অফিসার তার দিকে তাকিয়ে একটু হেসে চলে গেল দরজা বন্ধ করে ড্রাইভারের পাশে। ভ্যানটা বেরিয়ে গেল।

মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে রইল অহনা। খানিকটা দূরে স্বপ্নময়। ইতস্তত করে সে কাছে এল, 'আই অ্যাম সরি। আসলে আমি জানতাম না এসব হবে।'

অহনা নিরুত্তর।

'লোকটা তোমার পরিচিত বলে এ যাত্রা বেঁচে গেলাম। উঃ, থানায় নিয়ে গিয়ে বাড়িতে খবর দিলে কি হত ভাবলেই—। তোমার সঙ্গে ভাল চেনা?'

'না। চিনি না। কোনদিন দেখিনি।'

'তোমাকে হয়তো চেনে।' স্বপ্নময় বলল, 'দেখো, এরপর তোমার সঙ্গে দেখা করবে।'

'তো?'

'তুমি দেখা করো না, প্লিজ।'

'লোকটা তো আজ আমাদের বাঁচিয়ে দিল।'

'হ্যাঁ। কিন্তু আমরা আর ওকে সে-সুযোগ দেব না। আমরা কোনও নিরিবিলি জায়গায় কখনও যাব না। কফি হাউসে ভিড়ে বসব।'

এই সময় বাস এসে গেল। এই বাস অহনার পাড়ায় যাবে। অহনা বলল, 'এলাম।'

'এখনই। রাত ন'টা বাজতে অনেক দেরি। এখনই যাবে?'

'ওই লোকটা তাই বলে গেল।'

'বাঃ, ওই লোকটার কথা তোমার কাছে বড় হল?'

'অন্তত, আজকে তো নিশ্চয়ই—।' বাসে উঠে পড়ল অহনা।

খালি বাস। জানালার পাশে বসতেই তার চোখে পূর্ণিমার চাঁদ আটকে গেল। বাসটা ছুটছে, সঙ্গে চাঁদও। হঠাৎ খুব কান্না পেল অহনার। বুকের ভেতর থেকে কান্নাটা ছিটকে বেরিয়ে আসছে। প্রাণপণে নিজেকে সামলাতে চেষ্টা করল। এবং সেটা করতে করতে ও আবিষ্কার করল এইভাবে নিজেকে সামলে নেওয়ার নামই জীবনযাপন। এই রাতের কথা সে কখনও বলতে পারবে না। নিজেকেও নয়। একজন পুলিশের নাম বসন্ত, ভাবা যায়?

ভরদুপুরে শিশিরের দাগ

আজকাল আউটডোর শুটিং থাকলে বেশ অসুবিধে হয়। ছেলেমেয়েরা যদিও এখন আর ছোট নেই তবু সংসারের সমস্ত দায়িত্ব তো তার ওপর চাপিয়ে বসে আছেন স্বামী ভদ্রলোক। পঞ্চাশ পেরিয়ে যেতে তিনি আরও অলস, আরও ঘরকুনো হয়ে গেছেন। বই আর টিভির বাইরে শুধু অফিস যাওয়া-আসা ছাড়া তাঁর কোনো কর্তব্য নেই। অতএব অঞ্জলিকেই তাল রাখতে হয় সব সামলে। সেই ভোর থাকতে উঠে প্রত্যেকের খাওয়ার ব্যবস্থা করা, কি কি করতে হবে তা কাজের লোকদের বুঝিয়ে নিজে তৈরি না হতেই শুটিং-এর গাড়ি এসে যায়। তখন পড়ি কি মরি করে সময়ের সঙ্গে লড়াই চলে।

এখন অঞ্জলি বেশ ব্যস্ত শিল্পী। ছবিতে যখন প্রথম এসেছিল তখন অল্প বয়স, কিন্তু সুন্দরী হওয়া সত্ত্বেও নায়িকার ভূমিকা তার কপালে জোটেনি। পরিচালকরা বলত ওর চেহারায় একটা মা-মা ভাব আছে যা লাস্যময়ী নায়িকার থাকা উচিত নয়। ফলে যৌবনে টালিগঞ্জ তাকে তেমন ব্যস্ত রাখতে পারেনি। কিন্তু পঁয়ত্রিশ পার হবার পর থেকেই বউদি এবং মায়ের চরিত্রে অঞ্জলি একচেটিয়া হয়ে গেল। কোনো বাণিজ্যিক পরিচালক ওই ধরনের চরিত্রে অন্য কাউকে ভাবতে পারেন না।

অতএব এখন অঞ্জলির সংসারকে সুখের সংসার বলা চলে। অর্থের অভাব নেই, মানসিক অশান্তি তেমন নেই। ছেলেমেয়েরা এখন যে যার পড়শুনা নিয়ে ব্যস্ত। এখনকার প্রজন্ম স্কুলের শেষ ধাপেই ভবিষ্যৎ নিয়ে মাপা-ভাবনা ভেবে ফেলে। স্বামীর সঙ্গে অসদ্ভাব অঞ্জলির নেই। ভদ্রলোক তার কোনো কাজে বাধা দেন না। কিন্তু যত বয়স বাড়ছে তত যেন নিস্পৃহ হয়ে পড়ছেন তিনি।

দিন পনের আগে এক ছবির পরিচালক তার ডেট নিয়ে গিয়েছে। দার্জিলিং-এ যেতে হবে শুটিং-এ। বাংলা ছবির আশিভাগের আউটডোর হয় বোলপুরে। গোয়ালপাড়া, তালতোড় গ্রামগুলোয় এত শুটিং হয়েছে যে সেগুলো যেন সিনেমার সেট হয়ে গেছে এতদিনে। দার্জিলিং শুনে একটু খুঁতখুঁত করলেও রাজি হলো অঞ্জলি। অনেককাল দার্জিলিং-এ যাওয়া হয়নি। অবশ্য রাজি না হয়েও উপায় ছিল না। একবার যখন চরিত্রটিতে সে অভিনয় করেছে তখন ছবি সম্পূর্ণ করতে তাকে যেতেই হতো।

অন্যান্য বার যা করে না এবার সে তাই করল। ছেলেমেয়ে স্বামীকে প্রস্তাব

দিল সঙ্গে যেতে। সে যখন শুটিং করবে ওরা তখন ঘুরে বেড়াতে পারবে। দলের সঙ্গে গেলে অনেক কিছু কম খরচ কমে যাবে। কিন্তু ওরা কেউ শুটিং পার্টির সঙ্গে যেতে রাজি নয়। অগত্যা একাই বাড়ি থেকে বের হলো শিয়ালদা স্টেশনের উদ্দেশ্যে। দার্জিলিং মেলের এসি টু টায়ারে তার আসন ব্যবস্থা করে রেখেছে কর্তৃপক্ষ। নিউজলপাইগুড়ি স্টেশনে গাড়ি থাকবে অঞ্জলিকে দার্জিলিং-এ নিয়ে যাওয়ার জন্য।

সঙ্গে আর কোনো অভিনেতা-অভিনেত্রী অথবা টেকনিসিয়ান যাচ্ছে না। তারা ক'দিন আগেই রওনা হয়ে গিয়েছে। প্ল্যাটফর্মে তাকে দেখেই যাত্রীদের মধ্যে গুঞ্জন শুরু হয়ে গিয়েছিল। এসি টু টায়ারের সিটের তলায় ড্রাইভার স্যুটকেস ঢুকিয়ে চলে যাওয়ার পর অঞ্জলি নিশ্চিন্তে বসল। উঁচু ক্লাসের মানুষরা ফিল্মের লোক দেখলে গায়ের ওপর হামলে পড়ে না। এই বাঁচোয়া।

ট্রেন ছাড়ার পর সামনের বার্থের ভদ্রমহিলা তাঁর পাশ বসা ভদ্রলোককে বললেন, 'আলাপ করো না, যদি চিনতে পারেন।'

ভদ্রলোক বললেন, 'দুর! কতকাল আগের কথা। কেউ মনে রাখে!'

কথাগুলো অঞ্জলির কানে যেতে সে ওদের দেখল। না। এদের সে চিনতে পারছে না। একটা পত্রিকা বের করে মুখের সামনে ধরল অঞ্জলি।

এবার ভদ্রমহিলার গলা কানে এল,'এক্সকিউজি মি!'

পত্রিকা সরাল অঞ্জলি, 'বলুন।'

'কিছু মনে করবেন না, আপনি কি কখনও আর জি কর হসপিটালে থাকতেন? মানে, আপনার বাবার কি ওখানে কোয়ার্টার্স ছিল?'

মাথা নাড়ল অঞ্জলি, 'হ্যাঁ। কেন?'

'আমার নাম স্বপ্না। উনি আমার স্বামী ডক্টর রজত মুখার্জী। আপনারা যখন আর জি করে থাকতেন, তখন উনি সেখানে পড়তেন।'

অঞ্জলি নমস্কার করল। ভদ্রলোক হাতজোড় করে বললেন 'আমি সামান্য মানুষ। আমাকে আপনার মনে রাখার কথা নয়। আপনার বাবাকে আমরা খুব শ্রদ্ধা করতাম।'

'না। সত্যি, আমার মনে পড়ছে না।' অঞ্জলি হেসে ফেলল।

'আপনারা তিন বোন ছিলেন। খুব সুন্দরী। আমরা দূর থেকে আপনাদের দেখতাম। স্যার জানতে পারলে বিপদ হবে বলে কাছে ঘেঁষতাম না। মনে আছে আমাদের রি-ইউনিয়নে আপনি আপনার মায়ের সঙ্গে এসে

'বাঃ। আপনার স্মরণশক্তি দেখছি খুব ভাল।'

'এটা সম্ভব হয়েছে কারণ আপনি ফিল্মে নেমেছেন। পর্দায় আপনাকে দেখতে দেখতে কলেজ জীবনের স্মৃতি মনে পড়েছে। আপনি কোথায় যাচ্ছেন?'

'দার্জিলিং-এ। শুটিং আছে।'

'দার্জিলিং? ওখানে পরিতোষ আছে।' খুব নাম করেছে।' রজত মুখার্জী বললেন, 'আমি আছি শিলিগুড়িতে। যদি কখনও ভুল করেও আমার বাড়িতে পায়ের ধুলো দেন তাহলে কৃতার্থ বোধ করব।'

অঞ্জলি জবাব দিল না। রজত কি জেনেশুনে পরিতোষ নামটি উচ্চারণ করল? পরিতোষের সঙ্গে রজতের বন্ধুত্ব কি রকম ছিল? মুহূর্তেই নিজেকে সামলে নিল অঞ্জলি। নেহাতই ছেলেমানুষী। অল্পবয়সের বোকামি। সময়ের ধুলো জমতে জমতে যে নামটা অনেক অনেক নীচে তলিয়ে গিয়েছে, তাকে ঝেড়েঝুড়ে পরিষ্কার করে সামনে টেনে আনার কোনো মানে হয় না। বিয়ের পর স্বামীকে বলেছিল সে গল্পটা। এই নিয়ে হাসিঠাট্টা রসিকতা একসময়ে চললেও কখন তা থেমে গেছে চিরকালের মতো। এখন ট্রেনের কামরায় ওই নামটা শোনামাত্র প্রতিবার যেমন হয়, নিজেকে কী নির্বোধ লাগে।

তা যাক গে, পরিতোষবাবু তাহলে দার্জিলিং-এ আছেন। নাম যখন হয়েছে তাঁর ডাক্তার হিসেবে তখন টাকাপয়সাও হয়েছে। ভালই থাকুন তিনি তাঁর ডাক্তারনী স্ত্রীকে নিয়ে। অঞ্জলি কাজ করতে যাচ্ছে, কাজ করে ফিরে আসবে। ব্যাগ খুলে কৌটো থেকে পান এবং জর্দা বের করে মুখে দিল অঞ্জলি। কয়েক বছর ধরে এই নেশায় সে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে। একটু অস্বস্তিতে পড়লেই জর্দা তাকে বেশ চনমনে করে তোলে।

বাবা ছিলেন হাসপাতালের সুপার। সেই সুবাদে বিশাল কোয়ার্টার্স। তিন বোনের খোলা তলোয়াড়ের মতো রূপের সামাল দিতে মা হিমশিম। বাবা তাঁর কাজ নিয়ে এত ব্যস্ত থাকতেন যে অন্যদিকে মন দেবার তাঁর সময় ছিল না। অঞ্জলি তখন স্কুলের শেষ ক্লাসে। স্কুলের গাড়ি বাড়ির দরজা থেকে নিয়ে যেত, ফিরিয়ে দিত। ইচ্ছেমতো ঘোরাঘুরির স্বাধীনতা ছিল না। সে জানত বড় বলে তার দিকে ডাক্তারি পড়া ছেলেদের নজর আছে কিন্তু সে পাত্তা দিত না। তার কেবলই মনে হতো, এরা নয়ত স্বপ্নের পুরুষ রয়েছে অন্য গ্রহে, আকাশ থেকে নেমে এসে পক্ষিরাজে তুলে নিয়ে যাবে তাকে। হয়তো ভাবনাই তাকে পারিপার্শ্বিক সম্পর্কে উদাসীন হতে সাহায্য করেছিল।

সেবার কলেজের রি-ইউনিয়ন হবে। মাঠে বাঁশ পড়েছে প্যান্ডেলের জন্যে। সেদিন বিকেলে সে দোতলার বারান্দায় দাঁড়িয়ে দেখল কলেজের এন সি সির ছেলেরা মার্চ প্রাকটিস করছে মাঠে। হঠাৎ তার নজর পড়ল মার্চের নেতৃত্বে থাকা

ছেলেটির ওপর। ঝকমকে সুন্দর, লম্বা, এবং আলাদা। দেখামাত্র মনে হলো ওই তার স্বপ্নের পুরুষ। প্রতিটি পদক্ষেপে যেন তার বুকের সব ক'টা তন্ত্রীতে জলতরঙ্গ বেজে উঠছে। ওরা যখন তাদের বাড়ির সামনে দিয়ে যাচ্ছে যখন স্যালুট করার জন্য কপালে হাত ঠেকিয়ে ছেলেটি এদিকে তাকাল। সঙ্গে-সঙ্গে নিজের অজান্তে জিভ ভেঙচালো অঞ্জলি। ওই অবস্থায় যেতে যেতে ছেলেটির চেহারা যা হয়েছিল তা দেখে পরে সে হেসে বাঁচে না।

সেদিন সমস্ত সন্ধে— সন্ধের পর রাত — কিভাবে যে কেটেছিল তা নিজেই জানে না অঞ্জলি। সমস্ত শরীরে যেন জ্বরো জ্বরো অনভূতি। পরদিন সকালে সদ্য তৈরি হওয়া প্যান্ডেলের সামনে ছেলেদের জটলায় আবার তাকে দেখতে পেল সে। দেখামাত্রই ছুটে গেল ভেতরে। কাগজ কলম বের করে তর তর করে লিখে খেলল, 'কথা বলতে চাই। অনেক কথা আছে। না বলতে পারলে মরে যাব। অঞ্জলি।' চিঠিটা একটা খামে পুরে মুখ বন্ধ করে কাজের লোককে ডেকে বলল, 'শোন, ওই যে ছেলেটিকে দেখছ মাঠে দাঁড়িয়ে আছে, তাকে এই খামটা দিয়ে এসো। বাবা দিয়ে গেছে। ওকে একটু আলাদা ডেকে নিয়ে গিয়ে দেবে। বুঝলে।' লোকটা একটু বোকা ছিল। অঞ্জলি দেখল তার কথামতো কাজ করল লোকটা। একটু পরেই খাম খুলে কাগজে নজর বুলিয়ে ওপরের দিকে তাকাল ছেলেটা। তারপর গম্ভীর মুখে ফিরে গেল হোস্টেলের দিকে। বুকের মধ্যে ড্রাম বাজতে লাগল অঞ্জলির। তবে কি ও রাগ করল? রাগ করার কি আছে? সে যে কথা বলতে চায় এতে অন্যায়টা কোথায়? তার মতো সুন্দরী মেয়ে কিছু চাইছে এতেই তো ধন্য হয়ে যাওয়ার কথা। সেদিন সন্ধেবেলায় অনুষ্ঠান। সবাই মাঠে এসে গল্প করছে অথচ ছেলেটির পাত্তা নেই। নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছিল অঞ্জলির। কান্না পাচ্ছিল খুব। এই সময় টেলিফোন বাজল। দুপুরবেলায় মা তখন বাথরুমে, বাবা হাসপাতালে। সে রিসিভার তুলতেই শুনেতে পেল, 'হ্যালো'। গলার স্বর অচেনা। 'কাকে চাই?' অঞ্জলি বিরক্ত।

'অঞ্জলি আছে?'

'হ্যাঁ। বলছি। আপনি কে?'

'আমি পরিতোষ। চিঠি পড়েছি। আমি বলছি কি— ।'

'কখন দেখা হবে?'

'দেখা করতেই হবে?'

'হ্যাঁ। আজই। এখনই।'

একটু চুপচাপ। তারপর নিচুগলায় বলল, 'ঠিক আছে। আমি গেটের বাইরে আছি।'

'যেন ঝড় উঠল। দুদ্দাড় পছন্দের শাড়িজামা পরে ফেলে অঞ্জলি মেজ বোনকে বলল, 'এই, আমার এক বন্ধু এসেছে হাসপাতালে, আমি দেখতে যাচ্ছি।'

এভাবে সে কোনদিন বের হয় না। ফিরে এসে মায়ের বকুনি না হয় শোনা যাবে। পরিতোষ! নামটা মোটেই ভাল নয়। কি করা যাবে।

গেটের বাইরে দাঁড়িয়েছিল পরিতোষ। তাকে দেখেই হাঁটতে লাগল। দু'জনের মধ্যে ব্যবধান প্রায় দশ ফুট। হঠাৎ একটা ট্যাক্সি দাঁড় করিয়ে তাকে ইশারা করল পরিতোষ। চোখকান বুঁজে উঠে পড়ল অঞ্জলি। পরিতোষ বলল, 'কলেজ স্ট্রিটে চলুন।'

পুরোটা রাস্তা কেউ কথা বলল না। অঞ্জলি আড়চোখে দেখছিল। মনে হচ্ছিল বেশ নার্ভাস হয়ে গিয়েছে পরিতোষ। ঘামছে খুব। কলেজ স্কোয়ারের পাশে ট্যাক্সি ছেড়ে দিয়ে পরিতোষ জিজ্ঞাস করল, 'সরবত খাবে?'

'কি বলব সেটা কি বোঝা যাচ্ছে না?' অঞ্জলি ঠোঁট কামড়ালো।

'না মানে—!'

'দেখে তো মনে হয় না।'

'তুমি তো এবার ফাইন্যাল দেবে, তাই না?'

'হ্যাঁ। কেন?'

'শোন। এখন তোমার পড়াশুনার সময়। অন্যদিকে মন দিলে রেজাল্ট ভাল হবে না। স্যার দুঃখ পাবেন। আমার কথা বুঝতে পারছ?'

'না।'

'কেন?'

'আমি আজ পর্যন্ত কাউকে ভালবাসিনি। যাকে ভালবাসলাম তাকে পেতে চাই। এখন নয়। পড়াশুনা শেষ করে। কিন্তু আজ সেই কথাটা শুনতে চাই।'

'তুমি তো আমাকে জানো না—।'

'আমার জানার দরকার নেই।'

'আমি মফস্বলের ছেলে।'

'তাতে আমার কিছু এসে যায় না।'

'কিন্তু আমি যে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।'

'কিসের?'

'এই মাত্র পনের দিন আগে আমার এক সহপাঠিনীকে আমি কথা দিয়েছি। তাকে তো ফিরিয়ে দিতে পারি না। যদি তুমি আগে আমার কাছে আসতে তাহলে নাহয় ভাবা যেত। শোন, তুমি খুব ভাল মেয়ে। এসব ভুলে গিয়ে মন দিয়ে পড়াশুনো কর।' সস্নেহে বলল পরিতোষ।

হঠাৎ সমস্ত পৃথিবীটা অন্ধকার হয়ে গেল। পা টলতে লাগল অঞ্জলির। মনে হচ্ছিল সে পড়ে যাবে। আর সেইসঙ্গে কান্না এল। রাস্তায় দাঁড়িয়ে সুন্দর শাড়ি পরা একটি মেয়েকে কাঁদতে দেখলে ভিড় জমবেই। পরিতোষ তাড়াতাড়ি ট্যাক্সি ডেকে তাকে তুলে নিল। পাশে বসে সে যত বোঝায় তত কাঁদে অঞ্জলি। মনে হচ্ছিল বেঁচে থাকা অর্থহীন। নামার সময় বলে গেল, 'বয়ে গেছে। তোমার মতো ছেলে আমার প্রয়োজন নেই।'

বাড়িতে ঢুকে দেখল মা নেই। একা ঘরে ছটফটিয়ে উঠল। তার কেবলই মনে হচ্ছিল বেঁচে থেকে কোনো লাভ নেই। পৃথিবীর সব ভালবাসা নিয়ে পরিতোষ তার সহপাঠিনীর কাছে চলে গিয়েছে যখন, তখন বেঁচে থেকে কি লাভ! বাবার স্টকে যত ঘুমের ওষুধ ছিল সব একত্রিত করে দু'গ্লাস জল দিয়ে গিলে ফেলল অঞ্জলি। আঃ। এখন ঘুমোবে সে। চিরকালের জন্যে। ভালবাসাহীন হয়ে তাকে বেঁচে থাকতে হবে না। এক দুই তিন মিনিট। চুপচাপ দাঁড়িয়ে থেকে সে দেখল তার ঘুম আসছে না। পড়ে গিয়ে মরে যাচ্ছে না। সে চেয়ারে বসল। এবং তখনই একটু একটু করে ঘুমের স্পর্শ পেতে লাগল। তাহলে আমি মরে যাচ্ছি। আর আমার মৃত্যুর জন্য পরিতোষ দায়ী। সে আমার ভালবাসা প্রত্যাখ্যান করেছে। হঠাৎ খেয়াল হলো কেউ যেন বলেছিল ঘুমের ওষুধ বেশি খেয়ে যদি মিষ্টি খাওয়া যায় তাহলে মৃত্যু অনিবার্য। টলতে টলতে সে উঠল রান্নাঘরে গিয়ে মিষ্টির পাত্র থেকে টপাটপ গোটা ছয়েক রসগোল্লা মুখে পুরে দিয়ে ঘরে ফিরে এল।

অঞ্জলি যখন চোখ মেলল তখন সামনে আবছা অন্ধকার। আমি মরে গিয়েছি। নিশ্চয়ই আমাকে ভগবানের কাছে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। মায়ের কাছে শুনেছে যে মারা যাওয়ার পর চিত্রগুপ্ত ভগবানের সামনে জিজ্ঞাসাবাদ করেন। এই সময় সে প্রশ্ন শুনল, 'কেন এমন করলি? কেন? কেন ঘুমের ওষুধ খেতে গেলি।'

অঞ্জলি সত্যি কথা বলল। চিত্রগুপ্তের কাছে লুকিয়ে কোনো লাভ নেই। সে বলল, 'কি করব! পরিতোষ আমাকে—, আমাকে—। কথা শেষ করতে পারল না সে।

'পরিতোষ? সে কে?'

'বাবার ছাত্র। হোস্টেলে থাকে।' বলে সে আবার ঘুমিয়ে পড়ল।

ঘুম যখন ভাঙল তখন চারপাশে দিনের আলো। এর মধ্যে যে আটচল্লিশ ঘন্টা কেটে গিয়েছে, বাড়িতে ঝড় বয়ে গেছে, সে টের পায়নি। চোখ মেলে দেখল বাবা ঘর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছেন। সামনে বসে মা কাঁদছে। অর্থাৎ সে মারা যায়নি।

পরে জেনেছিল সুপারের মেয়ে বলে তাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়নি ঝামেলা এড়ানোর জন্যে। বাড়িতেই চিকিৎসার ব্যবস্থা করো হয়েছিল। পেট ওয়াশ করে যমে মানুষে লড়াই হয়েছে, যম হেরে গেছে।

মা বলল, 'ছি ছি ছি। এ তুই কি করলি? এভাবে আমাদের মুখ ডোবালি? জীবন কি এতই ফেলনা যে কিছু ভাববি না?'

এই সময় মেজ বোন এসে বলল, 'মা, এসেছে।'

বিছানায় শুয়ে অঞ্জলি দেখল পরিতোষ দরজায় দাঁড়িয়ে আছে চোরের মতো। তাকে দেখে মা বোনকে নিয়ে বেরিয়ে যাওয়ার আগে বলে গেল, 'বসো। কথা আছে।'

পরিতোষ বসল। তাকে খুব ভীত সন্ত্রস্ত দেখাচ্ছিল। এক দুই করে পাঁচ মিনিট গেল। মুখ নিচু করে রয়েছে পরিতোষ। হঠাৎই অঞ্জলির মনে হলো, এ কি করেছে সে? এই ছেলেটার জন্যে আত্মহত্যা করতে গিয়েছিল? কি আছে ওর? একটা মেরুদণ্ড পর্যন্ত নেই! সে চোখ বন্ধ করল। তারপরই মায়ের গলা কানে এল। মা পরিতোষকে ধমকাচ্ছে অঞ্জলির সঙ্গে সম্পর্ক তৈরী করার জন্যে। শেষ পর্যন্ত পরিতোষ বলল, 'বিশ্বাস করুন, আমার কোনো দোষ নেই। আমার সঙ্গে আগে আলাপই ছিল না। এই দেখুন, মাত্র সেদিন ও আমাকে একটা চিঠি লিখেছে। দেখা হলে আমি ওকে অনেক বুঝিয়েছি এসব ভুলে গিয়ে পড়াশুনা করার জন্যে। ওকে জিজ্ঞাসা করুন।'

'তোমার সঙ্গে তাহলে ওর কিছু ছিল না?'

'না। তাছাড়া আমার এক সহপাঠিনীর সঙ্গে বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে।'

'ও। কিছু মনে করো না তোমাকে এভাবে ডেকে আনলাম বলে। তুমি আসতে পার।'

'আপনি একটু স্যারকে বুঝিয়ে বলবেন, এ ব্যাপারে আমার কোনো দোষ নেই।'

আজ এত বছর বাদে হাসি পেল অঞ্জলির। স্যার রেগে গেলে পরীক্ষার ফল খারাপ হবে বলে ভয় পেয়েছিল পরিতোষ। অথচ বাবা ছিলেন অন্য ধাতের মানুষ।

দার্জিলিং-এ পৌঁছে শুটিং। সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত টানা। নিঃশ্বাস ফেলার জো নেই। অঞ্জলি উঠেছে অন্য শিল্পীদের সঙ্গে ভাল হোটেলে। সেদিন দুপুরে হঠাৎ বৃষ্টি নামায় শুটিং বন্ধ। যে বাড়িতে ওরা শুটিং করতে গিয়েছিল সেখানে

তখন জমিয়ে আড্ডা চলছে। এই সময় একটা গাড়ি এসে দাঁড়াল। গৃহকর্তা হন্তদন্ত হয়ে বেরিয়ে যে ভদ্রলোককে নিয়ে এলেন তিনি বেশ রাশভারি চেহারার, মাথায় বড় টাক। গৃহকর্তা সবার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলেন, 'ডক্টর পরিতোষ দত্ত। দার্জিলিং-এ উনি প্রায় ভগবান।'

পরিতোষ বললেন, 'ছি ছি ছি। আমি সামান্য লোক। এঁর বাড়িতে শুটিং হচ্ছে শুনে দেখতে চলে এলাম। আপনারা কত নামীদামী মানুষ। কাগজে ছবি দেখি।'

অঞ্জলি একটু দূরে বসে দেখছিল। বিন্দুমাত্র মিল নেই চেহারায়। এত পরিবর্তন হয় মানুষের! সেই ডাক্তারনী বোধহয় খুব যত্ন করে খাওয়ায়। শিল্পীরা সাধারণত উটকো লোকের সঙ্গে আড্ডা মারা পছন্দ করেন না। কিন্তু গৃহকর্তার উৎসাহে সবাই ওঁর সঙ্গে নমস্কার করছে। এই সময় হৈ হৈ করে উঠল টেকনিসিয়ানরা। বৃষ্টি বন্ধ হয়ে রোদ উঠেছে। ডিরেক্টর ছুটে গেলেন পরের শট নিতে। মুহূর্তে ঘর ফাঁকা। অঞ্জলির এই দৃশ্যে কাজ নেই। সে পানের কৌটো খুলল।

গৃহকর্তা তার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিতে ভদ্রলোক বললেন, 'মনে হয় উনি আমাকে চেনেন। ওঁর ছবি কত দেখেছি কাগজে।'

অঞ্জলি বলল, 'আমি আপনাকে চিনি? কি করে?'

পরিতোষ একটু হকচকিয়ে গেল, 'আপনার বাবা আর জি করের সুপার ছিলেন। আমি সেখানে ছাত্র হয়ে ছিলাম। অনেক দিন হলেও—।'

'তা হতে পারে। কত ছাত্রই তো ছিল বাবার।' উঠে দাঁড়াল অঞ্জলি।

হঠাৎ পরিতোষ বললেন, 'আপনার স্টকে আর পান আছে? একটা পেতে পারি?'

কাঁধ নাচাল অঞ্জলি, 'সরি! শেষ পানটা যে আমি খেয়ে ফেললাম। ইউ হ্যাভ মিস্‌ড দি বাস!' গটগট করে বেরিয়ে গেল অঞ্জলি শুটিং দেখতে।